নিজের আয়নায় সত্যজিৎ

দীর্ঘতম ও শেষ সাক্ষাৎকার

বর্দ্বীপ
৩০/৪৩, নয়াপট্টি রোড
কলকাতা-৭০০ ০৫৫

প্রথম সংস্করণ :
জানুয়ারী ১৯৯৩ ॥ পৌষ ১৩৯৯

ফটোগ্রাফ :
হীরক সেন

ডিজাইন :
কল্যাণ সরকার, গোপাল বসু

প্রকাশক
বঙ্গদ্বীপ
৩০/৪৩, নয়াপট্টি রোড
কলিকাতা-৭০০০৫৫

মুদ্রাকর
জে, জি, প্রেস
কলকাতা-৭০০ ০০৬

সূচি

দীর্ঘতম সাক্ষাৎকার

শেষ সাক্ষাৎকার

মুখবন্ধ

ছবি, ক্যালিগ্র্যাফি, বইয়ের প্রচ্ছদ, সায়েন্সফিকশন, ফেলুদা, গুপী গায়েন, বাঘা বায়েন, পথের পাঁচালী, চারুলতা, তথ্যচিত্র, সংগীত—সত্যজিৎ রায়ের প্রতিভা সবকিছুতেই সমান ভাস্বর। গ্রীক পুরাণের রাজা ক্রোসাস যা-কিছু ছুঁতেন তা সোনা হয়ে যেতো। কাজের ক্ষেত্রে তুচ্ছ কিংবা নগণ্য কিছু ছিল না সত্যজিতের কাছে—তা নন্দন-এর 'লোগো'-ই হোক কিংবা 'শতরঞ্জ কি খিলাড়ি'-র জন্য জেনারেল আউট্রামের স্টাডির আসবাবের স্কেচই হোক। প্রত্যেকটি কাজই সঠিক, নিখুঁত, অব্যর্থ। আমাদের ভাঙাচোরা টেরাবাঁকা জগতে একটা বিস্ময়কর ব্যতিক্রম। এমনকি ইন্টারভিউ-এর আপাত শিল্পহীন শিল্পেরও তিনি ছিলেন মাস্টার। তাঁর যেমন অসংখ্য বিষয়ে ছিল আগ্রহ ও কৌতূহল, যেমন অনিঃশেষ উৎসাহ, তেমন জাগ্রত তাঁর স্মৃতি এবং পুনরুদ্ধারের ক্ষমতা। অনেকে প্রশ্নের উত্তর দেন কাটা-কাটা; কারো-কারো জবাব অতিচালাক ও বাঁকা; কেউ একেবারে মুখেচোরা। কিন্তু সত্যজিৎ এক স্বপ্নের সাক্ষাৎকারদাতা। আড্ডার মেজাজে তিনি একের পর এক তথ্য, স্মৃতি, ভাবনা বিছিয়ে একটা সম্পূর্ণ জগৎ সৃষ্টি করেন—যার প্রমাণ এখানে গ্রন্থিত তাঁর জীবনের দীর্ঘতম, অন্যটি তাঁর শেষ—দুই সাক্ষাৎকার।

প্রথমটি নেওয়া হয়েছিল যখন সত্যজিৎ তাঁর মধ্যগগনে। ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন, প্রধানত, সদ্য বিলেতফেরৎ ব্যারিস্টার করুণাশংকর রায়। দলের সঙ্গীমাত্র ছিলাম 'কলকাতা'-পত্রিকার অন্যান্যেরা, যথা শুদ্ধশীল বসু, অমিয় দেব, সুবীর রায়চৌধুরী ও আমি। সত্যজিৎ রায়ের ৫০তম জন্মদিন উপলক্ষে প্রকাশিত 'কলকাতা' পত্রিকায় ২রা মে ১৯৭০ সালে এই সাক্ষাৎকারটি ছাপা হয়েছিলো। করুণাশংকর বিলেতে শুধু আইন নিয়ে পড়াশুনোই করেননি, সমান নিষ্ঠা দিয়েছিলেন চলচ্চিত্রের প্রতিও এবং এই নবতম কলার কোনও-কোনও দিকে সত্যজিৎ-এরও মনোযোগ আকর্ষণের ক্ষমতা তাঁর আয়ত্বে ছিল। তাছাড়া, তিনি ব্রিটেন থেকে এনেছিলেন এক বৃহদাকার টেপরেকর্ডার যন্ত্র—যার একটার মধ্যে এযুগের বিশটা সোনি ঢুকে যাবে। তাই নিয়ে আমরা কতোবার যে সত্যজিৎ-এর লেক টেম্পল রোড-এর বাড়িতে চড়াও হয়েছি। হাতে সিগারেটের টিন, পাশে সেই স্কেচপ্যাড, এলিয়ে বসে সত্যজিৎ আড্ডার মেজাজে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমাদের সময় দিয়েছেন। বিজয়া রায় জুগিয়ে গেছেন চা এবং এটা-সেটা। মাঝে-মাঝে যন্ত্রের ফিতে আটকে গেলে তা সামলাতে

করুণাশংকর ব্যস্ত থাকতেন, ফাঁক বুঝে আমরা অর্বাচীনেরা দুয়েকটা প্রশ্ন করে নিতাম। যদিও আমি তখন দ্য স্টেটসম্যান-কাগজের ফিল্ম ক্রিটিক, করুণাশংকরের তুলনায় সিনেমার আমি অ আ ক খ-ও জানতাম না।

দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল সত্যজিৎ শেষবার নার্সিং হোমে যাওয়ার ঠিক আগে; এবার সঙ্গী ছিলেন বিলেতের 'দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট' পত্রিকার প্রতিনিধি, টিম ম্যাকগার্ক। এই সাক্ষাৎকার ইংরিজিতে প্রকাশিত হয় 'দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট' কাগজে ও বাংলায় 'আজকাল' পত্রিকায় ২৯শে মার্চ ১৯৯২ তারিখে। যদিও ঐ বিশাল শরীর স্পষ্টতই বিকল হয়ে আসছিল, সত্যজিতের মেধা ছিল সমান উজ্জ্বল, স্মৃতি সেই একইরকম শক্তিমান। মাঝে-মাঝে বিজয়া রায় ঘরে এসে নীরবে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন যে আমরা সময়সীমা লঙ্ঘন করে যাচ্ছি, কিন্তু ঐ পরিবারের সংস্কৃতি এমনই যে তৎসত্ত্বেও চা এসে যাচ্ছিল। তাঁকে এবং সন্দীপ রায়কে তাঁদের সৌজন্য ও সহনশীলতার জন্য ধন্যবাদ।

জ্যোতির্ময় দত্ত

নিজের আয়নায় সত্যজিৎ

দীর্ঘতম ও শেষ সাক্ষাৎকার

শৈশব স্মৃতি

প্রশ্ন। আপনার জন্ম-সাল ?

সত্যজিৎ। ১৯২১।

প্র. কোথায় ?

স. কলকাতায়, গড়পারে।

প্র. বাড়ির ঠিকানা ?

স. যতোদূর মনে পড়ে ১০০এ গড়পার রোড, আপার সার্কুলার রোড থেকে ঢুকেই ডেফ অ্যাণ্ড ডাম স্কুলের ঠিক পিছনেই আমার ঠাকুরদাদার তৈরি বাড়ি।

প্র. জন্মের পর কতোদিন কেটেছে ও-বাড়িতে ?

স. তা প্রায় ছ-সাত বছর হবে।

প্র. তাহ'লে তো বাড়িটিকে ঘিরে কিছু স্মৃতি স্পষ্ট হ'য়ে আছে—

স. তা আছে বইকি। বাড়িটা ছিলো তিনতলা। ইউ. রায় অ্যাণ্ড সন্স, মানে আমার ঠাকুরদাদার ছাপাখানা ছিলো বাড়ির সামনের অংশটায়, উত্তরদিকে একতলা-দোতলা মিলিয়ে—একতলায় ছিলো ছাপাখানা, দোতলায় ব্লক-মেকিং আর কম্পোজিং। মাঝখানে ছিলো সিঁড়ি। আর বাড়ির দক্ষিণ অংশে অন্দরমহল। আমার অনেক সময় কেটেছে ঐ প্রেসে। মনে আছে আমি তখন ডি. জে. কিমার-এ ঢুকেছি, তখন একবার ভারত ফোটো টাইপের প্রেসে ঢুকে একটা জিনিশের গন্ধ পেয়েছিলাম—টারপেনটাইনের; গড়পারের পুরোনো স্মৃতি তৎক্ষণাৎ ফিরে এসেছিলো। আর মনে আছে, প্রত্যেক মাসে একটা-দুটো ছবি এঁকে নিয়ে যেতাম—সামনের মাসে 'সন্দেশ'-এ যদি ছাপা হয়। এবং প্রত্যেকবারই বলা হ'তো, হ্যাঁ বেরোবে। কিন্তু কোনোবারই বেরোয়নি।

প্র. চ'লে আসার পর গড়পারের ঐ বাড়িতে আর কোনোদিন ফিরে যাননি ?

স. বছর সাতেক আগে একবার গিয়েছিলাম, মারি—মারি সীটনকে নিয়ে। এখন তো ওটা স্কুল হ'য়ে গেছে—এথেনিয়াম ইনস্টিটিউশন—কাজেই বাড়িটা চিনতে খুব অসুবিধে হয়েছিলো। আগে বড়ো ছাপাখানা আর ব্লক-মেকিং ডিপার্টমেন্ট বিরাট-বিরাট দুটো হলে ছিলো, এখন একেবারে পাঁচিল তুলে চার-পাঁচটা ক'রে ঘর হ'য়ে গেছে সেখানে। তারপর আমাদের ছাদ—যেখানে আমরা লুকোচুরি টুকোচুরি খেলতাম, ঘুড়ি-

ঘুড়ি ওড়ানোর ব্যাপার থাকতো, তার ওপর ছাউনি দিয়ে সেটাও স্কুলের ঘর হ'য়ে গেছে। আর আমি যে-ঘরটায় জন্মেছিলাম সেটায় এখন হেডমাস্টার মশায় বসেন!

প্র. শৈশবের পর একটা জায়গায় ফিরে যাওয়া তো একটা রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা ; তা আপনি যখন ঐ বাড়িতে মারি-কে নিয়ে গেলেন

স. ভীষণ চিনতে পারলাম একটা জানলা—যেটা দিয়ে আমাদের বাড়ির বাগানটা দেখা যেতো। তারপর একটা পাঁচিল আর তার সামনের দিকটায় একটা গোল গর্ত—যাকে আমরা বুড়ি করতাম চোর-চোর খেলায়, সে-বুড়িটাকে দেখতে পেলাম। আমাদের বসবার ঘর—সেটায় মার্বেল ফ্লোরিং ছিলো, যে-রকম হয় : চৌকো-চৌকো স্ল্যাব, তাদের তাদের ওপর দিয়ে মার্বেল গড়িয়ে দিলে এক-এক রকম স্ল্যাবের ওপরে এক-এক রকম সুর হ'য়ে বেরোতো—তারপর কতগুলো জানলা, কাচ-টাচ, এ ও তা—দুপরবেলা নামতা পড়ার শব্দ শুনতাম। ডানপাশে এথেনিয়াম ইনস্টিটিউশন ছিলো তখন, আর পাশের বাড়িটা ছিলো সেই সন্তোষ দত্ত, মোহনবাগানের গোলকিপার, তাদের বাড়ি, আর সামনে ছিলো বিষ্টু ঘোষের আখড়া।…বাড়ি থেকে ডেফ অ্যান্ড ডাম স্কুলের মাঠটা দেখা যেতো, তাতে তাদের অ্যানুয়াল স্পোর্ট্‌স হ'তো। মনে আছে একবার জল-বৃষ্টি হয়েছিলো প্রচুর—বাগানে, মাঠে খুব জল হয়েছিলো।…বাড়িটা তৈরি হয় বোধহয় ১৯১৫-তে। কারণ বাড়ির সামনে তৈরি হবার তারিখটা বোধহয় লেখা ছিলো। আগে ওর সামনে ইউ. রায় অ্যান্ড সন্‌স ব্লক-মেকার্স ব'লে, ঐ উঁচু-উঁচু ক'রে লেখা ছিলো। আমার ঠাকুরদাদারই বোধহয় ডিজাইন করা বাড়িটা।… তার আগে [রায়-রা] সুকিয়া স্ট্রীটে [থাকতেন]। সে-বাড়ি আমি দেখিনি। ২২ নম্বর সুকিয়া স্ট্রীট। সেখানেও প্রিন্টিং ছিলো, প্রেস ছিলো, তারপর যখন এক্সপ্যান্ড করলো তখন ঐ বাড়ি ক'রে গড়পারে যাওয়া হ'লো।

প্র. আপনাদের গড়পারের বাড়িতে আর কে-কে ছিলেন ?

স. বাবা তো মারা যান আমার আড়াই বছর বয়সে। আমার মেজোকাকা সুবিনয় রায়, ছোটোকাকা সুবিমল রায়, মেজোকাকার স্ত্রী, তাঁর ছেলে, আমার ঠাকুমা মানে উপেন্দ্রকিশোরের স্ত্রী

প্র. সোজা কথায় একটি সাবেক যৌথ পরিবার ?

স. হ্যাঁ ; আর আমি, মা আর আমার দাদু কুলদারঞ্জন—উনি থাকতেন একতলায়, মুগুর ভাঁজতেন, বেশ মনে আছে।

প্র. ইনি কি শিকার-কাহিনীও

স. না, শিকার-কাহিনী লিখতেন প্রমদারঞ্জন। শিকার কাহিনী ঠিক নয়, বনের খবর। আর ইনি হলেন লীলা মজুমদারের বাবা।

প্র. রবিন হুড তো ইনিই লিখেছিলেন ?

স. রবিন হুড, কথাসরিৎসাগর, বেতাল পঞ্চবিংশতি, পঞ্চতন্ত্র, প্রথম শার্লক হোমসের অনুবাদ, প্রথম লস্ট ওয়ার্লডের অনুবাদ—সমস্তই উনি করেছিলেন।

প্র. ও'র সব বই-ই কি পাওয়া যায় ?

স. পাওয়া যায় সে খুব খারাপভাবে ছাপা।

প্র. আপনার পরিবারে প্রথম কলকাতায় আসেন কে ?

স. আমার মনে হয় আমার ঠাকুরদাই প্রথম আসেন—পড়তে। ও'রা তার আগে মৈমনসিংহে ছিলেন। ঠাকুরদা এলেন, তারপর ঠাকুরদার ভাইয়েরাও ক্রমশ—আমার বড়ো দাদু তো প্রিন্সিপাল হ'য়ে এলেন কলকাতার মেট্রোপলিটান মানে বিদ্যাসাগর কলেজে। তারপর দাদুরা আলটিমেটলি কলকাতায় এসে সেট্‌ল করলেন।

প্র. আপনি তো ছোটোবেলায় দেখেছেন 'সন্দেশ'-এর মুদ্রণ ?

স. প্রথম দিকটা। আমার বয়স যখন পাঁচ কি ছয়, তখন তো আমি মামাবাড়ি চ'লে এসেছি। বাবা মারা যাবার পর, কিছুদিন প্রেসটা চলেছিলো, 'সন্দেশ' চলেছিলো। আমার কাকা চালাতেন—সুবিনয় রায়। তারপর তো সে-ব্যাবসা লিকুইডেশনে চ'লে গেলো। কেন গেলো সেটা আমাকে বলা হয়নি। অনেক পরে আমি এসব জেনেছি। পারিবারিক দুরবস্থার কথা আমাকে কিছু বলা হয়নি, এবং অ্যাকচুয়ালি মা-র তখন নিশ্চয়ই ভয়ানক অসুবিধে হয়েছিলো। আমার ছোটোমামার ওখানে আমরা চ'লে আসি।

প্র. কোথায় ?

স. প্রথমে বকুলবাগানে। তারপর মামার সঙ্গে-সঙ্গে বেলতলা রোড। তারপর মামার বাড়ি হ'লো—রাসবিহারী অ্যাভিনিউতে। সেখান থেকে, চাকরি-বাকরি পাবার পর আস্তে-আস্তে আমি আর মা আলাদা হ'য়ে গেছি। প্রথমে বালিগঞ্জ গার্ডেনস-এ ছিলাম। তারপর তো লেক অ্যাভিনিউ, তারপর থেকে এই বাড়ি।

প্র. এই বাড়িতে কতোদিন ?

স. কতো, দশ বছর ?

বিজয়া রায়. দশ বছর।

প্র. কুলদারঞ্জন কি ঐ বাড়িতেই থেকে যান ?

স. ও-বাড়ি সকলকেই ছাড়তে হয়। ও-বাড়ি আমাদের আর রইলো না।

ওটা চ'লে গিয়েছিলো খানিকটা, করুণাবিন্দু বিশ্বাস ব'লে একজন ছিলেন, তাঁর হাতে—আপনি বোধহয় টেলিফোন ডিরেক্টরি খুঁজলে এখনো ইউ. রায় অ্যান্ড সন্স পাবেন। আমি বছর চারেক আগেও দেখেছি। কেননা করুণাবিন্দু বিশ্বাস এখনো আছেন এবং তিনি নাকি 'টুনটুনির বই' এখনো একটা বের ক'রে যান।

প্র. 'টুনটুনির বই'টা ওঁরা বের করেন ?

স. সঙ্গে-সঙ্গে সিগনেটও বার করে। কেননা আমরা কোনোদিন এক পয়সাও পাইনি বাপ বা ঠাকুরদাদার বই থেকে যতোদিন না সিগনেট প্রেস নেয় এবং সিগনেট প্রেস প্রথম চার বছর দিয়েছে, তারপরে আর দেয়নি।...করুণাবিন্দু বিশ্বাস বছরের পর বছর—পঁচিশ বছর ছাপিয়ে এক পয়সা দেননি, সেখানে ডি. কে. গুপ্ত করলেন কী, দুম ক'রে কাগজে দিয়ে দিলেন...আমরা বার করছি। কে অতো জানতো, হি ইজ ইন এ পজিশন টু ডু দ্যাট ?...করুণাবিন্দু আর সেটাকে কোনো কনটেস্ট করলো না। বই বেরোলো। 'রামায়ণ', মহাভারত', 'টুনটুনির বই', 'ছোট্ট রামায়ণ', 'আবোল তাবোল', 'হযবরল' ; তারপর এরা নিজেরা আরো দুটো বার করলো : 'ঝালাপালা', তারপর 'বহুরূপী' ; তারপর বোধহয়

প্র. 'পাগলা দাশু' ?

স. 'পাগলা দাশু'। এবং এরা যখন 'আবোল তাবোল' 'হযবরল'-র অরিজিন্যাল ফরম্যাটটা চেঞ্জ করলো, আমার কিন্তু আপত্তি ছিলো খুব। কেননা, সেই পুরোনো চেহারাটা অদ্ভুত। দিলীপকুমার গুপ্ত কী-সব বললেন-টললেন—যখন নিজে করছেন ; তারপর, ডিজাইনিং-এর দিকে একটা ইন্টারেস্ট আছে তো, আমি আবার সেই পুরোনোটা কেন ফলো করবো ? ক'রে দিলেন চেঞ্জ ক'রে। নতুন ছবি-টবি আঁকালেন, এ করলেন ও করলেন—তারপর তো আমিও ছেড়ে দিলাম বিজ্ঞাপন, উনি অ্যাকচুয়্যালি ছেড়ে দিলেন ডি. জে. কিমার। বাটা কোম্পানীতে গেলেন।

শিক্ষা ও শান্তিনিকেতন-স্মৃতি

প্র. আচ্ছা, এবার আমি একটু ফিরে যেতে চাই। ছ-বছর বয়সে আপনি যখন চ'লে এলেন বললেন, তার কতো পরে এবং কোথায় ইশকুলে গিয়েছিলেন ?

স. আমার তো একটাই স্কুল, একটাই কলেজ—বালিগঞ্জ গভর্নমেণ্ট হাই স্কুল ও তারপর প্রেসিডেন্সি কলেজ। আমি স্কুলে ভর্তি হই বছর দশেক বয়সে। একটু দেরিতে। তার আগে বাড়িতে পড়তাম মা-র কাছেই।

প্র. স্কুল ছাড়লেন কোন বছর ?

স. আমি থার্টি-সিক্সে ম্যাট্রিক দিই। তারপর প্রেসিডেন্সি থেকে নাইন্টিন ফোর্টিতে বি. এ.—তারপর শান্তিনিকেতন কলাভবনে আড়াই বছর।

প্র. রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর দিন

স. সকালবেলায় ওখানে (শান্তিনিকেতনে) একটা টেলিফোন গেলো। খালি পায়ে ছিলাম। খালি পায়েই চ'লে এলাম—আমি, কৌশিক—চার-পাঁচজন।

প্র. শান্তিনিকেতন কী-রকম আবহাওয়া তখন ?

স. সবাই বাড়ির বাইরে-বাইরে মাঠে ব'সে রয়েছে। তার চেয়েও বেশি যেটা মনে আছে রবীন্দ্রনাথ যেদিন চ'লে যাচ্ছেন—সেটা খুব টাচিং। অনেকে বললো—আমরা অতো কাছে যেতে পারিনি—অনেকে বললো, ওঁর চোখে জল দেখলাম। কেউ কখনো ওঁর চোখে জল দেখেনি। সেদিন, মৃত্যুর দিন, আমার পরনে ছিলো পাঞ্জাবি ও পায়জামা, পকেটে একটা দশ টাকার নোট ছিলো—সেটা আবার জোড়াসাঁকোর সামনে কে পকেট মেরে দিলো ভিড়ের মধ্যে। তারপর সেই জোড়াসাঁকো থেকে রাসবিহারী অ্যাভিনিউ আমরা হেঁটে ফিরলাম। বৃষ্টি নামলো মাঝে। শান্তি-নিকেতনের লোক ব'লে আমাদের আবার সেদিন ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয়েছিলো। অন্য লোকেদের, বাইরে থেকে, তাতে প্রচণ্ড একটা আপত্তি। তারপর তো রবীন্দ্রনাথের দাড়ি-ফাড়িও ছিড়ে নিলো—সেও দেখলাম। যখন ওঁকে কাঁধে তুললো তখন একটা টেরিফিক [ব্যাপার] হয়েছিলো, বীভৎস রকম। নন্দলালবাবু সাজাচ্ছেন শাদা ফুল দিয়ে, দেখলাম। তার পরের বছর ডিসেম্বরে শান্তিনিকেতন ছেড়ে দিই।

প্র. আপনি পড়া ছেড়ে ছবি আঁকা শুরু করলেন, এতে কেউ আপত্তি-টাপত্তি করেনি ?

স. সেটা আমি প্রথম থেকেই ঠিক করেছিলাম। মা-র একটা ইচ্ছে ছিলো যে আমি শান্তিনিকেতন যাই। আমার একটা শান্তিনিকেতনের ওপর রেজিসট্যান্স ছিলো। আমার আলটিমেটলি ইচ্ছে ছিলো গ্রাফিক-ডিজাইন—কমার্শিয়াল আর্টে যাবো। মা কতকটা জোর ক'রেই পাঠিয়েছিলেন—গিয়ে ওখানে খুব ভালো লেগেছিলো।

প্র. বি.এ-তে আপনি অর্থনীতি নিয়ে পড়েছিলেন তো ?

স. আমাকে পড়ানো হয়েছিলো অর্থনীতি। প্রশান্ত মহলানবীশ আমাকে বলতেন, তুমি যদি এটা নিয়ে পড়ো, তাহ'লে তোমাকে একটা আড়াইশো টাকা মাইনের চাকরি দিয়ে দেবো 'সংখ্যা' কাগজে। ওটায় আমার আকর্ষণ ছিলো না। আসলে কলেজটা আমার মাঠে মারা গেছে। কলেজে কিস্সু হয়নি।

প্র. সে আমাদের অনেকেরই। তবে…একমাত্র এ-ই যে বন্ধু-সঙ্গ—আপনার শান্তিনিকেতনে গিয়ে

স. হ্যাঁ, শান্তিনিকেতনে সেটা আমার আরো অনেক স্ট্রং—চার-পাঁচজন ছিলো, বিশেষ ক'রে একজন হচ্ছে পৃথ্বীশ নিয়োগী, আরেকজন দিনকর কৌশিক ব'লে একটি মারাঠি ছেলে যে এখন কলাভবনের প্রিন্সিপ্যাল হ'য়ে গেছে। আর আমরা চারজন ভারতবর্ষ ঘুরেছি। একমাসের জন্য একবার বেরিয়ে পড়েছিলাম, নাইন্টিন ফোর্টি-ওয়ানে সার্কুলার টুরে; মনে আছে আমরা চারজন ঐ অজন্তা ইলোরা সাঁচি খাজুরাহো বাঘ এই সমস্ত একেবারে কোণারক থেকে শুরু ক'রে ঘুরেছি।

প্র. কিছু ছবি এঁকেছিলেন ?

স. কোণারকের কিছু ছবি এঁকেছিলাম; আর যা এঁকেছিলাম সেগুলি নেই—কোণারকের কিছু কার্ড আছে আমার কাছে, খুঁজলে বেরোবে। ঝাঁসি থেকে বাঘ যাবার পথে প্রথম পনেরো দিন বাদে বোধহয় খবরের কাগজ দেখলাম। সেখানে দেখলাম ভীষণ স্কেয়ার হয়েছে কলকাতায়—জাপানিরা এসে গেলো, এসে গেলো ব্যাপার। আমার তখন একটু চিন্তা হ'লো, বাড়ির কোনো খবর পাইনি—টুর-টা কমপ্লিট না-ক'রে আমি লখনউ হ'য়ে বাড়ি চ'লে আসি। ইন ফ্যাক্ট, আমি শান্তিনিকেতন ছাড়ি, যেদিন কলকাতায় প্রথম বমিং হয়। তখন মনে হ'লো যে কী-রকম যেন ভীষণ আইসোলেশন হচ্ছে শান্তিনিকেতনে। ভালো লাগলো না। আমি শুধু নন্দলালবাবুকে বললাম যে আর শিখবো না। আমি যাই। ব্যস।

চাকরি-জীবন

প্র. *ফিরে এলেন যখন, কী দেখলেন কলকাতায় ?*

স. ফিরে এসে…আরো দু-একটা বোমা-টোমা পড়লো। খুব একটা কিছু

হ'লো না, একটা অ্যান্টি-ক্লাইমেক্স হ'লো। তারপর সেটা ছিলো ডিসেম্বর—মাস তিনেক ব'সে ছিলাম। তারপর তো ডি. জে. কিমার-এ জয়েন করলাম। পয়লা এপ্রিল।

প্র. আপনাকে ডি. জে. কিমার-এ

স. ডি. জে. কিমার-এ আমাকে ডি. কে. গুপ্তই ঢোকান। আমাদের বাড়িতে আসতেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক, ললিতবাবু ব'লে—ডি. জে. কিমার-এর বিজ্ঞাপন টিজ্ঞাপন তখন কাগজে বেরোতো—ডি. জে. না কী লেখা থাকতো। নামটা জানতাম না। একদিন কথা হচ্ছিলো, ভদ্রলোক বললেন, আরে মানিক, তুমি এখানে জেতে (যেতে) সাও (চাও), আমি দিলীপ গুপ্তেরে খুব সিনি (চিনি), তোমারে লইয়া যাইমু।

প্র. দিলীপবাবু ওখানে কী করতেন ?

স. দিলীপবাবু অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার ছিলেন, তখনো সিগনেট প্রেস আরম্ভ হয়নি। তখন দিলীপবাবুর সঙ্গে গিয়ে আলাপ করলাম। তিনি বললেন, ও তুমি সুকুমার রায়ের ছেলে—আচ্ছা, সেই বই টইগুলোর কী ব্যাপার বলো তো ? ...আমার মাইনে ছিলো পঁয়ষট্টি টাকা বেসিক, আশি টাকা ডিয়ারনেস অ্যালাওয়্যান্স।

প্র. কবে ছেড়ে দিলেন ?

স. 'পথের পাঁচালী' তৈরি ওখানে থাকাকালীন।

চলচ্চিত্রে উৎসাহ ও ফিল্ম সোসাইটি'র পত্তন

প্র. আচ্ছা, প্রথম আপনার চলচ্চিত্রে উৎসাহ কবে থেকে ?

স. আমার ফিল্ম দেখার উৎসাহ কলেজ থেকে। তখন একেবারে ফিল্ম ফ্যান।

প্র. কী সব ছবি তখন আসতো মেট্রো টেট্রোতে ?

স. নাইন্টি ফাইভ পার্সেন্ট আমেরিকান ছবি।

প্র. চ্যাপলিন ?

স. চ্যাপলিন তখন তো কালে ভদ্রে। আমার সিনেমায় উৎসাহ, মানে ফিল্ম জ্ঞান হবার পর চ্যাপলিন-এর একটিমাত্র, না দুটিমাত্র ছবি, তখন আমি দেখেছি, 'মডার্ন টাইম্স' ও 'গ্রেট ডিক্টেটর'। 'মডার্ন টাইম্স' —সেটা আমার জন্মদিনে এসেছিলো কলকাতায়, আমার তখনকার একটা ডায়েরি আছে ; তাতে লেখা আছে 'মডার্ন টাইম্স' দেখতে গেলাম।

প্র. আপনার জন্মের তারিখ কী ?

স. দোসরা মে, উনিশে বৈশাখ।

প্র. 'ভেদুর' দেখেননি ঐ সময় ?

স. ভেদুর-টেদুর তো অনেক পরে। পাঁচ বছরে একটা ছবি করতেন চ্যাপলিন তখন। চ্যাপলিন না, আরো অনেক আমেরিকান ছবি। এবং ছবি ভালো লাগলে দুবার তিনবার দেখা। এ রকম একটা হ্যাবিট ছিলো। তাও তখনো কোনো সীরিয়াস ইন্টারেস্টে পরিণত হয়নি। সেটা শান্তিনিকেতন যাবার পর। শান্তিনিকেতন লাইব্রেরিতে পল রোথা, পুডভকিন, বিশেষ ক'রে রেমণ্ড স্পটিসউড-এর তিনটি বই প'ড়ে আমার রিয়্যালি একটা ভীষণ সীরিয়াস ইন্টারেস্ট হ'লো।

প্র. আপনি তখন ভেবেছিলেন যে আপনি।

স. না, তখনো ভাবিনি। তখনো ভাবিনি ; তবে ফিল্মটাকে সীরিয়াসলি নেওয়া যায় ভেবে থাকলেও এখন মনে নেই সত্যি কথা বলছি। কেননা তার অনেক পরে ছবি আরম্ভ করেছি। তার আগেই ফিল্ম সোসাইটি তৈরি হ'লো। সেটা ফোর্টি সেভেনে।

প্র. পুডভকিন-কে কে আনেন ?

স. পুডভকিন-কে আমরা আনিনি। আগেই কলকাতায় এসেছিলো। তারপর আমরা আনি। তার আগে আমাদের ফিল্ম সোসাইটি ফর্ম ক'রে গেছে।

প্র. কে কে মেম্বার হলেন ?

স. আমি ছিলাম, বংশী ছিলো। বংশীর সঙ্গে ইউ. এস. আই. এস-এ আলাপ হ'লো। ওখানে ম্যাগাজিন পড়তে যেতাম—'থিয়েটার আর্টস' ইত্যাদি। ও-ও যেতো। অনেকদিন হয়েছে শুধু আমি আর ও। আলাপ হ'লো একদিন। দেখতুম এই লম্বা চুলওয়ালা ছেলেটা ভাঙা-ভাঙা বাংলা বলে। শুভ ঠাকুর ওকে নিয়ে এসেছে কাশ্মীর থেকে। তারপর চিদানন্দ। আমাদের বাড়ির কাছেই থাকতো—পণ্ডিতিয়া রোড না কোথায়। কী ভাবে ওর সঙ্গে আলাপ হ'লো মনে নেই। ফোর্টি-ফাইভ-ফোর্টি-সিক্স সাল থেকে ওকে মীট করছি—ও তখনো সিনেমা-টিনেমা বিশেষ দেখেনি। সেদিন সানডে মর্নিংএ কলকাতায়-কোমর জল। লাইটহাউসে 'গোল্ডরাশ' দেখানো হচ্ছে। আমি বললাম, যাও—সাঁতার কেটে দেখে এসো। ও গিয়েছিলো। তারপর 'পরিচয়' এ সমালোচনাও করেছিলো। দখল ছিলো বাংলায়, ইংরিজিটাও ভালো লিখতো। ফিল্ম সম্পর্কে আলোচনা আমাদের হ'তো। তখন ফিল্ম সোসাইটির কথাটা সাজেসটেড হয় ; চিদানন্দ বলে, আমার বাড়িতে একটা ঘর আছে

প্র. প্রস্তাবটা প্রথমে কার মাথায় আসে ?

স. দু-জনের—প্রায় সাইমালটেনিয়াস ; এটা ঠিক ক'রে বলা মুশকিল। এনি ওয়ে, আমার কাছ থেকে হয়তো এসেছে, হি গট ভেরি এনথুজিয়াস্টিক। আমার বাড়িতে ঘর ছিলো না, ওর বাড়িতে ঘর ছিলো—আমার যা বই-টই ম্যাগাজিন সব দিয়ে দিলাম। তার অনেক আগে থেকেই আমি 'সাইট অ্যান্ড সাউন্ড' রাখছি। শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে এসেই 'সিকোয়েন্স'ও রাখছি। তারপর ওখানে মীটিং আরম্ভ হ'লো, প্রথমে তো প্রায় তিন চার বছর ধ'রে পঁচিশ জনের মতো মেম্বার ছিলো—চারুপ্রকাশ ঘোষ, নিমাই ঘোষ ব'লে একজন যিনি 'ছিন্নমূল' ব'লে একটা ছবি করেছিলেন এককালে, এ রকম কিছু কিছু লোক।

প্র. টালিগঞ্জ, মানে স্টুডিয়োর সঙ্গে যোগাযোগ ছিলো ?

বিমল রায় ও নীতিন বসু

স. না, স্টুডিয়োর সঙ্গে তার আগেই [আমার] যোগাযোগ হয়েছে। ফিল্ম সোসাইটি করবার আগেই আমি একটি জিনিশ করতে আরম্ভ করেছিলাম—আমার চিত্রনাট্যের দিকে একটা ইন্টারেস্ট গিয়েছিলো। যে সমস্ত বাংলা বই কাগজে পড়তাম ছবি হচ্ছে, সেগুলোর আমি একটা খশড়া চিত্রনাট্য করতাম। তারপর সেটা ছবিটার সঙ্গে কমপেয়ার করতাম। ইন ফ্যাক্ট দুটো ভারশন অনেকসময় হয়েছে, একটা কী ওরা করবে, আরেকটা কী করা যায়।

প্র. সেগুলো আছে ?

স. সে রাখিনি। 'কালিন্দী', 'ফসিল', অনেক, অন্তত দশবারোটা চিত্র নাট্য আমি করেছিলাম। তারপর যখন বিমল রায় 'উদয়ের পথে'র পর 'ফসিল' অ্যানাউন্স করলো, তখন আমি বিমল রায়ের কাছে গিয়েছিলাম। বিমল রায়কে বলেছিলাম যে আমার একটা চিত্রনাট্য আছে। তা, উনি বললেন, আপনি একদিন আসুন টালিগঞ্জে। আমি থাকবো। আমি গেলাম। আমার মনে আছে আমি প্রায় চার পাঁচ ঘণ্টা ব'সে ছিলাম। বিমল রায় আর সুবোধবাবু চিত্রনাট্য নিয়ে আলোচনা করছিলেন। আমি অনেকক্ষণ ব'সে থেকে—যখন [বিমল রায়] আমাকে কিছু বললেন না, তখন বললাম, তাহ'লে আসি। উনি

বললেন, আসুন। এই হচ্ছে আমার একটা অভিজ্ঞতা। আর নীতিন বসু আমার নিকট আত্মীয় ছিলেন, নীতিন বসুর মা আর উপেন্দ্রকিশোর আপন ভাই বোন। তাই ওঁর শুটিং-টুটিং দু-একটা আমি দেখেছি। উনি বলতেন, মানিক, তুমি আর্ট ডিরেক্টর হ'তে পারবে। আমি ছবি আঁকতাম তো, ন্যাচারালি প্রথমে সকলেই আর্ট ডিরেক্টর হিশেবে ভাবতো আমাকে—এমনকি জোতির্ময় রায় আমাকে একবার ডেকে পাঠিয়েছিলেন। ঐ যখন 'অভিযাত্রী' ব'লে একটা ছবি করেন। আমি গিয়েছিলাম, সেটাও কিছু হয়নি আলটিমেটলি। তাতে শুভ ঠাকুর ছিলো আর্ট ডিরেক্টর। বংশী শুভ ঠাকুরকেই অ্যাসিস্ট করেছিলো। তারপর মানিকবাবুর একটা গল্পের একটা চিত্রনাট্য করেছিলাম তখন. গল্পটা 'ভেজাল' এ বেরিয়েছিলো—'বিলামসন' ব'লে একটা গল্প আছে, খুব নাটকীয় গল্প। সেটাতে একজন প্রোডিউসার ইণ্টারেস্টেড হন মি. বসু ব'লে। তিনি ছিলেন জ্যোতির্ময় রায়ের 'অভিযাত্রী'র প্রোডিউসার। তিনি একদিন আমায় ডেকে পাঠালেন, বললেন, চিত্রনাট্য আনো। তার সেই বিরাট ঘর, বিরাট লম্বা টেবিল—চিত্রনাট্য আমার তো পুরো লেখা থাকতো না, আমার মুখস্থ থাকতো, সঙ্গে ছোটো ছোটো কাগজে নোট্‌স থাকতো – তা উনি নিজে জাজ করতে পারবেন না ব'লে কিছু পরিচালক এবং কিছু ক্যামেরাম্যানকে ডেকেছিলেন সেদিন। একজন ক্যামেরাম্যান হচ্ছেন বিদ্যাপতি ঘোষ, বেশ নাম করা ক্যামেরাম্যান। একজন ডিরেক্টর হচ্ছেন নীরেন লাহিড়ি। সে ভারি ইণ্টারেস্টিং ব্যাপার। তখন প্রায় বারো আনা গল্প বলা হ'য়ে গেছে। ভদ্রলোক আমার পাশে ব'সে আমার কাগজগুলো দেখছিলেন। হঠাৎ আমার পিঠে হাত দিয়ে বললেন, শুনুন, আপনি যে ঐ ফেড আউট টেড আউটগুলো লিখেছেন, এগুলোর মানে বোঝেন? এ সবের অনেক পরে অবশ্য 'পথের পাঁচালী'।

প্রচ্ছদশিল্প ও টাইপোগ্রাফিতে আগ্রহ

প্র. আমি একটু ফিরে যাচ্ছি। প্রথম যখন সিগনেট প্রেস চালু হ'লো

স. ফোর্টি ফাইভে বোধহয়—আমার তখন কাজ হ'লো সিগনেটের বইয়ের মলাট করা—একধার থেকে একগাদা বইয়ের মলাট তখনকার দিনে করেছি।

প্র. আমার মনে আছে ছাত্রজীবনে শুনতাম, 'সুকুমার রায়ের ছেলে পিতার মুখরক্ষা করেছে—কী চমৎকার বইয়ের মলাট করে!'

স. আমাকে বিমল রায়ও তা-ই বললেন, ও আপনি। আপনি কী অদ্ভুত মলাট করেন। 'মলাট করেন' কতোদিন ধ'রে যে শুনতে হয়েছে। তখন ভীষণ ক্যালিগ্রাফিতে আমার ইণ্টারেস্ট ছিলো। ইন ফ্যাক্ট, বিজ্ঞাপনের অন্য দিকটায় সত্যি কথা বলতে কি আমার একদম ইণ্টারেস্ট নেই—ভীষণ একটা ফাঁকা ব্যাপার ব'লে মনে হয়। ক্যালিগ্রাফি ও টাইপোগ্রাফিতে আমার এখনো ইণ্টারেস্ট আছে এবং নতুন ভঙ্গিতে বাংলা টাইপ বের করারও ভীষণ একটা ইচ্ছে আছে—যদি কখনো অবসর পাই। তিন চার রকম আমার মাথায় আছে—স্ক্রিপ্ট টাইপ, এ টাইপ, একটা টাইপ—পাইকা—আগেকার যে ফর্মটা ছিলো, এইটিন্থ সেঞ্চুরির কিছু বইয়ে পাওয়া যায়—সেটা এখনকার চেয়ে বেটার ব'লে আমার মনে হয়। —অনেক বেশি সেন্সিবল, অনেক ভালো। নতুন টাইপগুলো কি পাতে দেওয়া যায়? বীভৎস। এই শ্রী টি ব'লে কতকগুলো টাইপ বেরিয়েছে না?

প্র. দেখুন একটা বিদেশী বই হাতে নিয়ে—ওদের কী রেঞ্জ! মলাটই করে শুধু টাইপ বদলে বদলে।

স. হ্যাঁ, ওটা টাইপোগ্রাফির ওপর হয়। এখানে সেটা ক্যালিগ্রাফিতে করা হয়েছে। টাইপোগ্রাফিতে কিছু করা যায় না তো। এখানে ব্রাশের ওপর বা কলম দিয়ে কতো রকম হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। এখন অবশ্য কাজ করছে এবং ভালো কাজ করছে অনেকে। তখন বিশেষ কেউ ছিলো না—দি ফীল্ড ওয়াজ অ্যাবসোলিউটলি ক্লিয়ার

প্র. আচ্ছা, সে যুগের দেব সাহিত্য কুটির ইত্যাদির ছোটোদের বই বা তাদের ইলাসট্রেশন

স. তাদের সঙ্গে কোনোদিন আমার যোগাযোগ ছিলো না। এককালে, এই ধরুন তেরো চোদ্দো বছর বয়সে, অবশ্য খুব ভালো লাগতো—পরে ভীষণ খারাপ লাগতো ঐ ইলাসট্রেশন।

বিদেশী সংগীতে উৎসাহ

প্র. শুনেছি, আপনার কাছে সে সময়ে বিদেশী সংগীতের রেকর্ডের কলকাতার শ্রেষ্ঠ কালেকশন ছিলো?

স. শ্রেষ্ঠ কিনা জানি না—তবে বাঙালিদের মধ্যে ওটা ওয়ান অফ দি বেস্ট হ'তে পারে। কেননা সত্যি কথা কলতে কী, হাতে গোনা যেতো সে সব বাঙালিদের, যারা তখন রেকর্ড কিনতো। সেই টি. ই. বেভান কোম্পানি ছিলো ড্যালহৌসি স্কোয়ারে, আমরা বিলিতি রেকর্ড কিনতে গেলে তো সেখানে ওরা অবাক হ'য়ে গেলো। বললো ক্লাসিক্যাল রেকর্ড তো কেউ কেনে না—খালি ঐ চঞ্চলবাবুর নাম করেছিলো, মানে চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়, কবি। আর নীরদবাবুর কিছু ছিলো, মানে নীরদ চৌধুরীর। একদা, আমার শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন, নীরদবাবু দিলীপ বিশ্বাসের সঙ্গে 'সমসাময়িক' ব'লে একটা কাগজের তিনচারটে সংখ্যা বের করেছিলেন—তাতে ওঁর একবার একটা প্রবন্ধ ছিলো 'ইউরোপীয় সংগীতের সন্ধানে', 'একলা' ছদ্মনামে। তখন কলকাতায় এসে চক্রবেড়েতে ওঁর সঙ্গে আলাপ করতে যাই। ওখানেই প্রথম হ্যান্ডমেইড গ্রামোফোন দেখলাম—ই. এম. জি.র গ্রামোফোন। সে ভীষণ ব্যাপার, বাঁশের নীড্‌ল দিয়ে তৈরি করেছিলো বিলেতের একটা কোম্পানি, ই. এম. জি. ব'লে। রেকর্ড কেনার শুরুতে কী রকম ছিলো জানেন? একটা সিম্ফনির একটা মুভমেণ্ট একমাসে কেনা হ'লো, নেক্সট মাসে সেকেণ্ড মুভমেণ্ট। থর্ড মাসে থর্ড মুভমেণ্ট—এ রকম ভাবে কেনা হ'তো। এবং এখনো ঐ সব হাজার হাজার সেভেণ্টি এইট প'ড়ে রয়েছে।

প্র. আচ্ছা, এই সংগীতের উৎসাহটা তো আপনার পারিবারিক?

স. বিলিতি সংগীতের উৎসাহটা পারিবারিক কিনা জানি না। তবে গড়পারের বাড়িতে একটা টোয়েণ্টিজের রেকর্ড ছিলো, বেটোফেনের ভায়োলিন কনচার্টোর একটা মুভমেণ্ট। সেটা কার, আজ পর্যন্ত ট্রেস করা যায়নি। সেটা আমি সাত-আট বছর বয়স থেকে শুনেছি। তারপর ঐ বুক অফ নলেজ-টলেজ প'ড়ে কম্পোজারদের, বিশেষ ক'রে বেটোফেনের, জীবন সম্বন্ধে আমার একটা হীরোর মতো [শ্রদ্ধা] হয়েছিলো। কেউ যদি বেটোফেনের একটা বায়োগ্রাফি আমাকে করার সুযোগ দেয় তো আমি করতে পারি, এবং একদিন হয়তো সীরিয়াসলি ওয়েস্ট কি ঈস্ট জার্মানিকে একটা অফার দেওয়া যেতে পারে। আমার মনে হয় না এখনো কোনো কম্পোজারের জীবনী-চিত্র ঠিকভাবে তোলা হয়েছে। তখন থেকেই ইণ্টারেস্ট এবং ফর্স্ট ইয়ারে একটা কনসিউমিং ইণ্টারেস্ট হয়।

প্র. আপনি তো এমনিতে ভারতীয় সংগীত

স. ভারতীয় সংগীতের উপর তখন একটা অবজ্ঞার ভাব ছিলো—তারপর একটা স্টেজ আসে যখন ভীষণভাবে—

প্র. আপনি তখন বোধহয় সেতার শিখতেন ?

স. আমি তো শিখিনি সেতার। আমি কোনো বাজনা বাজাইনি—গ্রামোফোন ছাড়া। অবশ্যি পিয়ানোটা এখন আমাকে বাজাতে হয় কম্পোজিশনের জন্য।

প্র. আপনি সমস্ত সুরগুলো নিজে

স. ওটার একটা সুবিধে আছে। কারণ আমি যখন মিউজিক শুনতাম, ঐ মিনিয়েচার স্কোর—কম্পোজার্‌স স্কোর পাওয়া যায় না।—সেটার সঙ্গে-সঙ্গেই শোনার অভ্যেস করেছিলাম এবং ওটা 'আমার প্রায় বেডসাইড রীডিং হ'য়ে গিয়েছিলো—স্কোর নিয়ে রাত্রে শুতে যেতাম।

আবহ-সংগীত

প্র. আপনি স্কোর প'ড়ে বাজনা শুনতেন ?

স. হ্যাঁ, হ্যাঁ। এবং সেটা এখন কাজে লাগছে—'তিনকন্যা'র পর থেকে, যখন আমি ডিসাইড করলাম যে আমি নিজে মিউজিক করবো—তবে ভীষণ কঠিন, প্রথম-প্রথম ভীষণ সময়সাপেক্ষ, এখন আস্তে-আস্তে একটা ফেসিলিটি এসে যাচ্ছে।

প্র. আপনি বোঝাতে পারেন আপনার

স. বোঝানোর খুব একটা দরকার হয় না, কেননা আমি দিশি-বিলিতি দু-রকম নোটেশনই জানি। কাজেই আমি এটা দু রকমভাবেই লিখে দিই। দু একজন আছে এখানে বিলিতি মিউজিশিয়ান—খুব কাজের, সিমফনি অর্কেস্ট্রায় বাজায়, যেমন স্ট্যানলি গোমেজ—তারা বিলিতিটা থেকে বাজায়। আবার অনেকে যারা সেতার, সরোদ টরোদ বাজায়, তাদের আবার বিলিতি নোটেশনে অভ্যেস নেই, তাদের জন্য দিশি নোটেশনে আমি লিখে দিই। আর যখন লেখায় কাজ হয় না, তখন গান গাওয়া, শিস দেওয়া—এগুলো তো আছেই।

প্র. নিশ্চয়ই আপনার প্রোফেশন্যাল সংগীতজ্ঞদের নিয়ে কাজ করতে খুব অসুবিধে হয়েছে ?

স. তা কিছু হয়েছে। এর মধ্যে রবিশংকরের একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে অর্কেস্ট্রেশনের। অন্যদের ফিল্ম মিউজিকের কোনো ব্যাকগ্রাউন্ডই নেই। ওরা বোঝে নাচের বাজনা—এবং ওরা এমন বাজনা করে, যেটা ছবির সঙ্গে খাপ খাওয়ানো মুশকিল হয়। সেটা ভীষণ হয়, কেননা

ওরা গাইডেড হ'তে চায় না—ক্ল্যাশ হ'তে থাকে। পারসোন্যাল লেভেলে এতো বন্ধুতা রয়েছে! সেজন্য ওটা আমি বন্ধ ক'রে দিলাম।

প্র. আচ্ছা, প্রসঙ্গত জিগগেশ করি, ক্লাসিক্যাল সংগীতজ্ঞরা যখন সিনেমায় আবহ সংগীত রচনা করেছেন, তখন কি তাঁরা কেউ সফল হননি? ধরুন প্রোকোফিয়েফ।

স. ম্যাগনিফিসেণ্ট। প্রোকোফিয়েফের কোনো তুলনা নেই। তারা বোঝে জিনিশটা। তাদের ও ট্রেনিংটা সঙ্গে সঙ্গে হ'য়ে যায়।

প্র. কিংবা বার্নস্টাইন।

স. বার্নস্টাইন-এর চেয়েও আমার মনে হয় প্রোকোফিয়েফ—ও হচ্ছে গ্রেটেস্ট এভার! আমার কাছে 'ইভান দ্য টেরিবল' এর ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিকটা আছে, শুনেছেন কখনো?

প্র. না, আলাদা ক'রে কখনো শুনিনি।

স. ওটা অসাধারণ মিউজিক। ওটার মজা হচ্ছে—এবং সেটা খুব রেয়ার ব্যাপার—ফিল্মের সঙ্গেও ওটা শুনতে ভালো লাগছে, আবার এমনি শুনতেও সাংঘাতিক। অবশ্যি আমার মনে হয় ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিকটার ফিল্ম ছাড়া বিচার করার কোনো প্রয়োজন নেই এবং সেটা যদি খারাপ লাগে, তবে সেটা সংগীতের দোষ নাও হ'তে পারে। ছবির সঙ্গে পড়লেই হয়তো সেটা খুলবে।

প্র. আচ্ছা, 'পোটেমকিন'-এর মিউজিকটা কি শুনেছেন?

স মাইজেলের, না? না, ওটা আমি শুনিনি।

প্র. আর একটা কথা, পশ্চিমী সংগীতজ্ঞদের নিয়ে ভালো ছবি হয়নি এ-কথাটা কি ঠিক? পুরোনো মার্কিন ট্রেডিশনে তোলা ডিয়ার্টালের 'লাইফ অব উইলিয়াম ভাগনার' দেখেননি আপনি?

স. ভাগনার তো ডিয়েটার্লি তোলেননি! তবে হ্যাঁ, শপ্যাঁর একটা ছবি দেখেছিলাম, 'এ সং টু রিমেমবার', পল মুনি অভিনয় করেছিলো—বাজে, কর্নি। ঐ রকম শুবার্টের একটা ফিল্ম করেছিলো ওরা—'নিউ ওয়াইন' ব'লে।

প্র. আচ্ছা, 'সেণ্টিমেণ্ট্যাল জার্নি" না কী ব'লে একটা স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি দেখেছিলেন? বোধহয় আইজেনস্টাইনের করা, শপ্যাঁর সংগীতের পরিপ্রেক্ষিতে আকাশে মেঘের বিচিত্র র‍্যাপসডি আর কী!

স. না তো। একটা আমেরিকান ছবি দেখেছি ব্রামস আর শুমানের ব্যাপার [নিয়ে]। ক্যাথারিন হেপবার্ন ছিলো, আর রবার্ট ভাগনার। তবে জার্মানরা কিছু ভালো কাজ করেছে এ বিষয়ে। আচ্ছা, আবেল গাঁসের করা বেটোফেন দেখেছেন আপনি?

প্র. না, দেখিনি।

স. হ্যারি বাওয়ার করেছে বেটোফেন। ইতিহাস একেবারে উল্টে-পাল্টে বসিয়েছে, থর্ড সিমফনির আগে ফিফ্‌থ সিমফনি বাজিয়ে ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু অভিনয় টভিনয় অসাধারণ। তবে রোমান্টিসাইজ ক'রে বায়োগ্রাফি করতে গেলেও তো একটা মাত্রা থাকা উচিত।

বাংলা চলচ্চিত্র

প্র. আচ্ছা, তিরিশের যুগে যখন নিয়মিতভাবে হলিউডের ছবি দেখা শুরু করেছেন বলেছেন, তখন কি আপনি বাংলা ছবিও দেখতেন?

স. খুউব কম দেখেছি। আমার কাকা, নীতিন বোস, ও'র তৈরি ছবি ছাড়া—ও'র সব ছবিই দেখতাম, 'ভাগ্যচক্র', 'দেশের মাটি', 'দিদি', 'জীবন মরণ' ইত্যাদি।

প্র. মোটামুটিভাবে ঐ সময় বা কিছু আগে থেকেই বাংলা সিনেমায় নিউ থিয়েটার্সের যুগ চলছিলো—দেবকী বসু, প্রমথেশ বড়ুয়া, এ'দের কিছু দেখেননি?

স. প্রমথেশ বড়ুয়ার কিছু তখন দেখিনি। ও'র ইমেজটা আমার কাছে কী রকম—মানে স্টিল দেখলেই, কী রকম গোলমাল লাগতো। দু একটা ছবির ট্রেইলার যা দেখেছি, ভালো লাগেনি—ও'র কথা বলার ঢঙ, ও'র অভিনয়। অনেক পরে দেখেছি 'মুক্তি' টুক্তি। তবে দেবকীবাবুর 'বিদ্যাপতি', 'চণ্ডীদাস' দেখেছি, ধরুন তিরিশের যুগে। সে একরকম মন্দ লাগেনি—এন্টারটেইনিং। ইগফ্যাক্ট রিঅ্যাকশনটা কিন্তু রিপ্রোডিউস করা এখন অসম্ভব। তবে বাড়িতে এসে ঠাট্টা টাট্টা হ'তো—'চ—ণ্ডী ঠা—কু—র, এ কি সত্যি', এ ধরনের ব্যাপার। যতোদূর মনে আছে এগুলো খুব কমিক্যাল লাগতো।

প্র. আচ্ছা, সে যুগে বিদেশী, মুখ্যত ইংরেজি, মার্কিন ছবি, দেখতে যাবার সময় একটা সীরিয়াস কিছু, গভীর শিল্পচেতনা সম্বন্ধ কিছু দেখতে যাচ্ছেন—এই রকম একটা মেণ্টেল ফ্রেমওয়ার্ক থাকতো নাকি আপনার?

স. সেটা বোধহয় অনেক পরে এসেছে। তখন কিছু পার্সোন্যালিটিজ দেখতে যেতাম, কিছু গান শুনতে যেতাম—এস্টেয়ার রজার্সের নাচ গান খুব ভালো লাগতো—তার মানে, যেতাম পিওরলি অ্যাজ এ ফিল্ম ফ্যান। মনে পড়ছে তখন একটা ডায়েরি ছিলো—এই চৌত্রিশ প'য়ত্রিশ

সালের, কিছুদিন আগে সেটা খুঁজে পেয়েছি—ওর শেষের একটা পাতায় তখনকার যা ফিল্ম দেখেছি, সেগুলোর নাম লিখে তাদের পাশে স্টার দিয়েছি। চার হচ্ছে হাইয়েস্ট, তিন, দুই—এইভাবে যেতো আর কি! তার মধ্যে বাংলা ছবি দুটোর বেশি কখনো পেয়েছে ব'লে মনে পড়ে না। আর চার পেয়েছে, ধরুন—তাহ'লে একটু আন্দাজ পাবেন—ডেভিড কপারফিল্ড। বুঝতেই পারছেন, বাংলা ছবি একটা ক্ষ্যামাঘেন্না ক'রে দেখার ব্যাপার ছিলো—ঐ চেনাশোনা লোক অনেকে রয়েছে, তাদের নাম আছে, তাই।

প্র. তাহ'লে কলেজে পড়ার সময়ে কোনো একটি বাংলা ছবিকেও বিশেষভাবে উল্লেখ্য বা আকর্ষণীয় ব'লে মনে হয়নি ?

স. না। তবে টেকনিক্যালি, ফোটোগ্রাফি টোটোগ্রাফির দিক থেকে নীতিনবাবুর ছবির মধ্যে বেশ একটা—ফোটোগ্রাফিতে তখন আমার বেশ ইন্টারেস্ট। আমি জানতাম উনি একজন বড়ো ক্যামেরাম্যান এবং আত্মীয় হ'লে যা হয় আর কি—একটা গর্বের ব্যাপার ছিলো। 'দেশের মাটি' না কিসে যেন একটা ঝড়ের দৃশ্য ছিলো, তখন মনে হয়েছিলো, বাপরে বাপ, কী ক'রে তুলেছে! অবশ্যি পরে দেখে বুঝেছিলাম যে স্টুডিওতে তৈরি করা ঝড়।

আলোকচিত্রের অভিজ্ঞতা

প্র. ফোটোগ্রাফিতে ইন্টারেস্টের কথা বললেন, তাহ'লে নিজে ছবি তুলতেন নিশ্চয়ই ?

স. বোধহয় চোদ্দো-পনেরো বছর বয়সে একটা ভয়েটল্যান্ডের ব্রিলিয়ান্ট ক্যামেরা পেয়েছিলাম, তা দিয়ে কিছু দিন ছবি তুলেছি মনে আছে। তখন 'বি. ও. পি.'—'বয়েজ ওন পেপার' ব'লে একটা নাম-করা ছেলেদের কাগজ ছিলো, বিলেত থেকে বেরোতো—এখনো বেরোয়, তবে চেহারাটা বদলে গেছে। আমি সেটা সাবস্ক্রাইব করতাম। তাতে ফটো-সিক্সে ফোটোগ্রাফিতে একবার ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছিলাম মনে আছে—এক পাউন্ড না কতো।

প্র. ছবি তুলে কি নিজেই ডেভেলপ করতেন নাকি ?

স. না, আমি কোনোদিন নিজে ডেভেলপ করিনি, একটা দোকানে গিয়ে করাতাম। তখন এক দাদা-স্থানীয় লোক আসতেন বাড়িতে। খুব

ডেভেলপ করতেন মনে আছে, ওঁর ডার্করুমে অনেক সময় কাটিয়েছি ছেলেবেলায়।

প্র. ছবি দেখতে গিয়ে ফোটোগ্রাফির দিকটা কি বিশেষভাবে লক্ষ করতেন না? এমনকি সে যুগেও?

স. ফোটোগ্রাফিতে একটা ইন্টারেস্ট ছিলো বরাবর—তবে স্টুডিওতে শুটিং দেখার আগে ব্যাপারটা খুব একটা ধারণা করতে পারিনি।

প্র. আর ইংরেজি ছবিতে আলোকচিত্র শিল্পীদের নাম—সেগুলো কি বিশেষ-ভাবে লক্ষ করতেন না, তিরিশের, চল্লিশের যুগে? যেমন, তার অনেক পরে আমরা গোগ্রাসে গিলেছি লাস্যালি, দেকা, কুতাদ বা ফ্রান্সিসের নাম।

স. হ্যাঁ, মনে আছে—সেগুলো পরের দিকে আরম্ভ হয়েছে, কলেজের ফার্স্ট ইয়ার থেকে—লুবিচ, লিরয়, ক্ল্যারেন্স ব্রাউন, গার্বোর ছবি যিনি তুলতেন। এগুলো অবশ্যি ফ্যান ম্যাগাজিনের দৌলতে। সীরিয়াস ফিল্ম ম্যাগাজিন তখনো কিছু পড়িনি।

সংগীতে অনুরাগ

প্র. আর সেটা শুধু ক্যামেরাম্যানদের বেলা কেন, আপনি নিশ্চয়ই আবহ সংগীত রচয়িতাদের নামও চিনতেন এবং ঐ একই ভাবেই?

স. হ্যাঁ, তবে ম্যাক্স স্টাইনার, এরিখ কর্নগোল্ড, মিক্লস রোজা—এঁদের নাম কেন, কাজও চিনতাম। নাম না জানা থাকলেও ব্যাক-গ্রাউন্ড মিউজিক থেকে বুঝতে পারতাম যে এঁদের কাজ

প্র. সেটার কারণ কি এই যে সংগীতটা বরাবরই আপনি নিজে পড়তে পারতেন?

স. তার চেয়ে, আমার মিউজিক্যাল মেমরি খুব ফিনোমেন্যাল ছিলো ব'লে। একটা পুরো সিমফনি আমার তিনবার শুনলে মুখস্থ হ'য়ে যেতো। এবং যে-কোনো জানা ওয়ার্কের একটা সেকেন্ড-ও রেডিয়োতে শুনলে আমি ব'লে দিতে পারতাম এটা কোন ওয়ার্ক।

প্র. আপনি নিয়মিত রেডিয়ো শোনেন?

স. তখন আমি রেডিয়োটা শুনতাম। মনে আছে যুদ্ধের টাইমটাতে বি. বি. সি. ভীষণ শুনতাম মাঝ রাত্রে উঠে। তখন নারায়ণ মেনন বিলেতে ছিলেন, ইনি আবার বীণাতে বাখ বাজাতেন—ভীষণ শুনতাম।

ইন ফ্যাক্ট জার্মান ব্রডকাস্ট শুনেছি—জার্মানিতে মিউজিকটা অপূর্ব ভালো হ'তো—হিটলারের বক্তৃতাও শুনেছি।

প্র. আচ্ছা, সংগীত তখনই এতো নিষ্ঠার সঙ্গে শুনতেন জেনে মনে হচ্ছে যে আর্ট-ফর্ম হিশেবে সংগীতকে আপনি রেকগনাইজ করেন প্রেটি আর্লি—কিন্তু সিনেমাকে নয়।

স. না, তখনো নয়।

প্র. তাহ'লে সিনেমা এবং সংগীত এ-দুটোর অর্কেস্ট্রেশন যে কোথাও না কোথাও হ'তে পারে এ-কথা আপনার মনে হয়নি ?

স. মিউজিকের দুটো দিকই ছিলো। খুব পপুলার মিউজিকও পছন্দ করতাম, জ্যাজের ওপর তখনই আমার একটা ইন্টারেস্ট ছিলো—যদিও বাড়িতে অবশ্য জ্যাজের রেকর্ড খুব বেশি কিনতাম না। তখন আমার কাছে অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং মনে হ'তো—আমি যে এস্টেয়ার রজার্সের নাম করলাম, তাঁর কিছু মিউজিক্যাল, অর্ভিং বার্লিন, জর্জ গের্শন এ'দের সমস্ত, মিউজিক্যাল যাকে বলে—এখন 'সাউন্ড অব মিউজিক'-এ যে-জিনিশটা চেহারা নিয়েছে আর কী। ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটে ট্যাপ ডান্সিঙের যুগ ছিলো। তবে ফিল্ম আর মিউজিক, এ দুটোর সমন্বয় ক'রে কাজ করবো, কোনোদিন এটা কখনো মাথায় আসেনি।

প্র. আচ্ছা, জ্যাজের প্রসঙ্গে জিগগেশ করি, আজকে জ্যাজ যে মর্যাদা পেয়েছে ইউরোপে, কি আমাদের দেশের বিদগ্ধসমাজেও, ১৯৭০ সালে এ ব্যাপারে কী অ্যাটিটুড ছিলো আপনাদের ?

স. জ্যাজ তো তেমন ইন্টেলেকচুয়্যাল নয় যেমন, যেমন কুল জ্যাজ কি

প্র. কি ব্লুজ

স. কি ব্লুজ। সেই জিনিশটা তখনো আসেনি, মোটেই আসেনি। তখন ফক্স-ট্রট, রুম্বা—একটা সময় মনে আছে বিগ অ্যাপ্‌ল এলো। তখনো জ্যাজ যে একটা আলোচনার বিষয় এটা কেউ মনে করতো না, ভালো লাগতো শুনতে এই পর্যন্ত।

প্রথম চিত্রনাট্য, প্রথম পেশাদার অভিনেতা

প্র. 'পথের পাঁচালী'র চিত্রনাট্য রচনার পরিকল্পনা কী ক'রে এলো ?

স. যখন আমি ঐ ডি. জে. কিমার এ কাজ করি ফার্টি থ্রী থেকে, তখনই দু

চারটে চিত্রনাট্য লেখার ব্যাপারে ঝোঁক যেতে আরম্ভ করেছিলো। নাইন্টিন ফর্টি ফাইভে আমি প্রথম 'পথের পাঁচালী' পড়ি, যখন আমি ইলাস্ট্রেট করি, তখন। ফর্টি ফাইভ থেকেই কিন্তু ওটার একটা ছবি করার বাসনা আমার মনের মধ্যে ছিলো। 'পথের পাঁচালী' হচ্ছে ফার্স্ট বুক আই এভার ইলাস্ট্রেটেড।

প্র. এটাই কি আপনার প্রথম চিত্রনাট্য ?

স. এটা আমার সেকেন্ড চিত্রনাট্য, মানে ফুল ফ্লেজেড চিত্রনাট্য। প্রথম ছিলো 'ঘরে বাইরে'—ফর্টি সেভেনে করেছিলাম। তখন আমরা ফিল্ম সোসাইটি স্টার্ট করেছি, হরিসাধন দাশগুপ্ত হলিউড থেকে ফিরেছেন, উনি মেম্বার হলেন। আমরা তার আগেই 'ঘরে বাইরে'র ফিল্ম স্ক্রিপ্ট নিয়ে আলোচনা করেছি অল্প বিস্তর। রাধামোহন বাবুর যাতায়াত ছিলো ফিল্ম সোসাইটিতে, উনি বলেছিলেন নিখিলেশ অভিনয় করবেন। তা হরিসাধন আমাকে বললে, আপনি একটা সিনারিও লিখুন। দুম ক'রে হরিসাধন সেই ফাঁকে কোন সময়ে যেন 'ঘরে বাইরে'র ডবল রাইট্‌স কিনে ফেললো বিশ হাজার টাকা খরচ ক'রে। আমি চিত্রনাট্য লিখবো, ও পরিচালনা করবে এবং বংশী আর্ট ডিরেক্টর হবে।

প্র. ক্যামেরা চালাবেন কে ঠিক হয়েছিলো ?

স. ক্যামেরার কথা বোধহয় অজয় করকে বলা হয়েছিলো। যা-ই হোক, তারপর একজন প্রোডিউসারের সঙ্গে কন্ট্রাক্ট হ'য়ে গেলো। উনি আমাকে বললেন, আপনাকে দেবো দু হাজার। সে কন্ট্রাক্টের চিঠি আমার কাছে রইলো। হরিসাধনও আড়াই হাজার না কতো টাকার কন্ট্রাক্ট পেয়ে গেলো, সে পরিচালনা করবে। আমরা লোকেশন টোকেশন দেখতে বেরোলাম। পাণ্ডুয়া ফাণ্ডুয়া, এদিক ওদিক, উত্তরপাড়া টুত্তরপাড়া সব দেখা হ'লো—কিছু জমিদারের বাড়ি—ঘোড়ার গাড়ি টাড়ি সব ঠিক। এমন সময় হঠাৎ একদিন প্রোডিউসার—তাঁর নাম মজুমদার ছিলো—ডেকে পাঠালেন; বললেন, শুনুন, আপনার চিত্রনাট্য তো শুনলাম, ওটা আমার এক বন্ধুকে শোনাতে চাই। তিনি আমার গুড অ্যাডভাইজার সে বন্ধু ছিলেন—নামটা ভুলে গেছি—এক ড. ঘোষ, ভিনিরিয়্যাল ডিজিজ স্পেশ্যালিস্ট। যাই হোক, তিনি শুনলেন। কিছুদিন বাদে মি. মজুমদার বললেন, আমার বন্ধু আর আমারও মনে হচ্ছে, কিছু অল্পবিস্তর পরিবর্তন করলে মন্দ নয় না। আমি হরিসাধনকে বললাম, দেখুন, এ বাগড়া দিচ্ছে। আমি কিন্তু পারবো না, আমি ওসব পরিবর্তনের মধ্যে নেই। হরিসাধন বললে, কেন মশাই, আপনি এই প্রথম ছবি করছেন, একটু চেঞ্জ টেঞ্জ ক'রে দিন না। আমি বললাম,

না, আমি পারবো না। তারপরে এই খবর যখন মজুমদারের কাছে পেঁছিলো, তখন তিনি আমাকে চিঠি লিখলেন, তোমার কণ্ট্রাক্ট নাল অ্যান্ড ভয়েড হ'য়ে গেলো, তুমি আমার কথা শোনোনি। হরিসাধন বোধহয় তারপর মাস ছয়েক কথা বলেনি আমার সঙ্গে, কেননা সঙ্গে সঙ্গে ওর কণ্ট্রাক্টটাও গেলো। তারপরে এই ধরুন বছর চারেক আগে, এই সেদিন, আমি সে চিত্রনাট্য খুলে পড়লাম। দেখলাম খুব কাঁচা। ভগবান বাঁচিয়েছেন—যদি ভগবান থাকেন।

প্র. ওটার চিত্রনাট্য কি আবার লিখেছেন নাকি?

স. ওটা আবার সম্পূর্ণ অন্যরকম ভাবে আমার ভাবা আছে, তবে এখনো তুলিনি, কেননা একটা রিয়্যালাইজেশন আসতে লাগলো যে ঐ তিনজন অভিনয় করবার মতো লোক নেই। তারপর তো 'পথের পাঁচালী' করলাম। আর 'পথের পাঁচালী'র পর অটোমেটিক্যালি 'অপরাজিত'টা এসে গেলো। তারপর 'অপরাজিত' যখন মার খেলো, তখন আই ওয়াণ্টেড এ কনট্রাস্ট। এবং কী কনট্রাস্ট করা যায়? আমার মনে হ'লো বাঙালিরা তো গান বাজনা পছন্দ করে, 'জলসাঘর' করা যাক। 'জলসাঘর'-এ কিন্তু গান বাজনা ভয়ানক সীরিয়াস হ'য়ে গেলো। 'জলসাঘর'-এ যে ধরনের কনসেনট্রেটেড হাই কোয়ালিটি ক্লাসিক্যাল মিউজিক ছিলো, সেটা তো সচরাচর থাকে না। 'জলসাঘর' মন্দ চলেনি গোড়ার দিকে, পরে দেয়ার ওয়াজ এ শার্প ড্রপ।

প্র. 'জলসাঘর' কিন্তু বিদেশীরা খুব ভালো নিয়েছে। আপনি কি সিনথিয়া গ্রেনিয়ারের লেখাটা পড়েছেন?

স. হ্যাঁ, হ্যাঁ, ট্রু কোয়ালিটিজ অব এ গ্রেট নভেল তো? তারপর সিনথিয়ার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিলো। আমি ওকে বললাম, তুমি বড্ডো বেশি প্রশংসা ক'রে ফেলেছো, যখন বার্লিনে দেখা হয়েছিলো। তা, ও বললে, না, মোটেই না। কিন্তু সিনথিয়া বড্ডো বাড়াবাড়ি করেছে। কারণ কিছু দুর্বলতা ছবিটার মধ্যে আছে ব'লে আমার নিজেরই মনে হয়েছে। সে যাই হোক

প্র. 'জলসাঘর'ই তো প্রথম যেখানে একজন পেশাদার অভিনেতাকে আপনি বড়ো চরিত্রে নিলেন? তা, তার আগে ছবিবাবুর অভিনয় দেখে কি আপনি বিশেষভাবে

স. ছবিবাবুকে যে আমার খুব একটা ভালো লাগতো তা নয়। তবে, ন্যাচারালি এক ধরনের থিয়্যাট্রিক্যাল প্রফেশন্যাল অভিনয়ে উনি খুব পাকা, দক্ষ ছিলেন। আমার মনে হয়েছিলো 'জলসাঘর'-এ বিশ্বম্ভর রায়ের যে চরিত্র, তাতে ওঁকে হয়তো খাপ খাইয়ে যাবে। কেননা ওঁর

সেই জমিদারির মেজাজটা আছে। তারপর দেখলাম দুটো দিকে ভদ্রলোক একেবারে কাঁচা। এক হচ্ছে, তিনি ঘোড়া টোড়া জীবনে কখনো চড়েননি ; আর দুই—এটা শুনলে শক্‌ড হবেন—তাঁর মধ্যে মিউজিক ব'লে কোনো বস্তুই ছিলো না। সংগীতে তাঁর কোনো রিঅ্যাকশনই ছিলো না। তাল, লয়, সুর—তাঁর কোনোরকম জ্ঞানই ছিলো না। এজন্য একটা ডিসঅ্যাডভানটেজ হয়েছিলো। আমার মনে হয়, জলসার যে 'সীন'গুলো রয়েছে সেগুলোতে ওঁর রিঅ্যাকশন আরো ট্রেইনড্‌, আরো নলেজেবল হওয়া উচিত ছিলো।

প্র. কিন্তু তারপরেও তো আপনি ছবিবাবুর কাছে ফিরে গিয়েছিলেন ?

স. ফিরে গেছি, কারণ ছবিবাবুর সঙ্গে আমার চমৎকার একটা রাপোর্টের সৃষ্টি হয়েছিলো। হি লেট মি গাইড হিম, যেটা আর কোনো ডিরেক্টরকে তিনি করতে দেননি। বলতেন, বলুন, আপনি কী ভাবে করবেন ? এবং তারপরে যখনই ছবিবাবুকে নিয়েছি, রাশভারি জমিদার—যেমন 'দেবী', 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'ও কতকটা তা ই। ওল্ড স্কুলের একটা জাঁদরেল লোক। কাজেই, সেখানে ছবিবাবু ছাড়া তো আর কেউ ছিলো না ঐ রোলগুলো করবার জন্য। যেখানে বড়ো বড়ো ডায়ালগ, বড়ো বড়ো সাসটেইনড্‌ অভিব্যক্তির প্রশ্ন আসে, সেখানে এক ধরনের প্রফেশন্যাল কমপিটেন্স প্রয়োজন।

প্র. কিছু আগে বললেন যে 'ঘরে বাইরে'র তিনটি চরিত্র করবার মতো কাউকে পাননি ব'লে আর কাজে হাত দেননি। মোটামুটিভাবে এখনো কি আপনার তাই ধারণা ?

স. সেও কতকটা। তাছাড়া কাজ করলাম, হবার অবস্থায় গিয়ে পৌঁছলো, তারপর হ'লো না—তারপর সেটা সম্বন্ধে কী রকম একটা ডিসইন্টারেস্টেড ভাব জন্মে যায় মনে। এবং ওটা—টু হুইপ আপ এনথুজিয়াজম ফর এ প্রজেক্ট হুইচ হ্যাজ ফলেন থ্রু ওয়ান্স—মুশকিল। এবং যখন দেখলাম চিত্রনাট্যটা খুব কাঁচা হয়েছে, নতুন ক'রে সব আবার ঢেলে সাজাতে হবে, তখন একটা খুব রেজিসট্যান্স এলো, এবং তাছাড়া পরপর প্রায় কতকগুলো গপ্পো পেয়ে যেতে থাকলাম—যেমন 'জলসাঘর' হ'লো। 'জলসাঘর' ইনটেরেস্ট ক'রে—কেননা ছবিবাবু চ'লে গেলেন—'পরশপাথর' হ'লো—আই ওয়াণ্টেড টু মেক এ ফিল্ম উইথ তুলসী চক্রবর্তী—ভীষণভাবে নেগলেক্টেড ছিলেন। তারপর 'দেবী' হ'লো। আমি প্রতিবারই যখন ছবি করেছি. 'পথের পাঁচালী' এবং 'অপরাজিত' র ঐ সিকোয়েন্সটা বাদ দিলে, সবসময়ই তার আগের ছবির চেয়ে বিপরীতধর্মী ছবি করার দিকে গেছি।

প্র. আচ্ছা, 'দেবী' এবং 'চারুলতা', এই দুটি কাহিনীতে যে সময়টা আছে তা আপনি অসাধারণভাবে চিত্রিত করেছেন। তারপরেও কি মনে হয়নি 'ঘরে বাইরে'তে বাংলাদেশের অন্য একটা ফেলে আসা পিরিয়ড আপনি ইভোক করতে পারবেন ?

স. হ্যাঁ, তা খুবই মনে হয়েছে। মনে হয় বছরখানেকের মধ্যেই 'ঘরে বাইরে' হবে। আমার তো ইচ্ছে রয়েছে। ওটা আবার হয় কী জানেন ? অনেকসময় মনে হয় যেন আর গপ্পো নেই। তখনি মনে হয়, আগে তো কতগুলো ছিলো, সেগুলো আবার ভেবে দেখি না। 'ঘরে বাইরে'—রবীন্দ্রনাথে আবার ফিরে যেতে ইচ্ছে হয় এবং পিরিয়ডে। পিরিয়ডটার মধ্যে ভারি মজা আছে, ওটা আমার খুব ইন্টারেস্টিং মনে হয়। রিক্রিয়েশনের মধ্যে একটা আলাদা মজা আছে সেটা সমসাময়িক কোনো গল্পে পাই না, একটা চ্যালেঞ্জ আছে।

উনিশ শতক ও আধুনিক কাল

প্র. আচ্ছা, আমাদের অনেকেরই মনে হয়েছে, আপনি সমসাময়িক কালকে যে ভাবে জানেন, তার থেকে অনেক বেশি, অনেক অন্তরঙ্গভাবে জানেন অতীতকে, এক বিগত পিরিয়ডকে—যাকে মাঝে মাঝে আশ্চর্য জীবন্তভাবে চিত্রিত করেন আপনার ছবিতে। কিংবা আপনার মানসিক গঠনের একটা ইনটেন্স রাপোর্ট হয় অতীতের সঙ্গে, বিগত সময়ের সঙ্গে—ধরুন 'দেবী'র কাল কিংবা 'চারুলতা'র সময়টার সঙ্গে বিশেষ ক'রে।

স. 'চারুলতা'র সময়টার সঙ্গে বিশেষ ক'রে।

প্র. সেটা বোধহয় খুঁজে পান না সমসাময়িক কালে—'মহানগর' বা 'নায়ক' দেখতে গিয়ে মনে হয়েছে।

স. 'চারুলতা'র একটা ভীষণ চ্যালেঞ্জ তো রয়েছেই—যেমন, দেখা যাক না এইটিন সেভেন্টি নিয়ে কী করা যায় ? এবং পরে সে-সম্বন্ধে পড়েছি, অনেকদিন ধরে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে খবরের কাগজের ফাইল ঘেঁটেছি —তখনকার বিজ্ঞাপন, তখনকার এডিটোরিয়্যাল, তখনকার টাইপোগ্রাফি, তখনকার কাগজের ফরম্যাট। ভূপতি যে কাগজ বের করলো সেটার ফরম্যাট, মার্জিন, টাইপোগ্রাফি, ইগজ্যাক্টলি সুরেন বাঁড়ুজ্যের 'বেঙ্গলি'র মতো ; শুধু মাস্ট হেডটা আমি নিজে ডিজাইন করেছি। তা না

হ'লে, বিজ্ঞাপনের রেট টেট সম্বন্ধে যা উক্তি আছে, তা সবই কিন্তু 'বেঙ্গলি'র সঙ্গে ট্যালি ক'রে যাচ্ছে। পড়তে পড়তে কী রকমভাবে সমস্ত জিনিশটা জ্যান্ত হ'য়ে উঠতে থাকে, তখন তাতে যা উৎসাহ পাওয়া যায়, সেটা আজকের জীবন, যেটা সকলেই দেখছে এবং আমার কোনো ইক্সক্লুসিভ প্রপার্টি নয়, সেখানে সেই চ্যালেঞ্জটা ততো বড়ো ব'লে মনে হয় না। সো দেয়ার ইজ এ করেসপণ্ডিং ল্যাক অব ইণ্টারেস্ট—খানিকটা হ'য়ে যায়। সেই চ্যালেঞ্জটা তো আর থাকে না। কেননা এই রিয়্যালিটির সঙ্গে তো সকলে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখতে পারে। এখানে আমি এই জিনিশটা রিক্রিয়েট করছি, অথচ আই অ্যাম ক্রিয়েটিং দ্যাট কনভিকশন বাই ভার্চু অব সার্টেন ডিটেইল্স, যেমন ডিজরেলিকে ডিজি বলা হ'লো। ···তবে ডিটেইলের প্রশ্ন সব সময়ই আছে। আজকের দিনটাও যখন সিনেমার পর্দায় তুলতে চেষ্টা করবো, তখন পারিপার্শ্বিক চেহারার মিল ছাড়াও, মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ছোটো খাটো ডিটেইলের মধ্যে দিয়েই সেটা ফুটিয়ে তুলতে হবে। যেমন 'মহানগর'-এর বাড়ির ভেতরটায় অনেক জিনিশ খুব সাকসেসফুলি করা আছে ব'লে আমার মনে হয়।

প্র· অনেকে মনে করেন যে আপনি যখনই অনেকদিন নাড়াচাড়া করেছেন এমন কাহিনী নিয়ে ছবি তোলেন, তখন তার মধ্যে অনেক বেশি ইনটেন্স ইমোশন্যাল জিনিশ ফুটে ওঠে, যেমন 'পথের পাঁচালী' কি 'চারুলতা' কি 'গুপী গাইন'। এই ছবিগুলোর ভেতর একটা ইমোশন্যাল কোয়ালিটি ছিলো, একটা ইনভল্ভমেণ্টের ছাপ, যেটা না থাকলে বড়ো শিল্পকীর্তি অসম্ভব। কিন্তু 'অভিযান', 'কাপুরুষ ও মহাপুরুষ', 'কাঞ্চনজঙ্ঘা', 'চিড়িয়াখানা'—ইত্যাদি চিত্রের পেছনে কোনো দীর্ঘ পরিকল্পনা ছিলো না এবং অনেকের কাছে এগুলি কিছুটা কম ইনস্পায়ার্ড মনে হয়েছে।

স. সবক্ষেত্রে এ কথা বলা চলে না কিন্তু। যেমন 'অপুর সংসার' আমার নিজের মনে হয় খুব উৎকৃষ্ট কাজ, কিন্তু ছবিটা তোলার ডিসিশনটা ছিলো হঠাৎ নেওয়া এবং ওর শুটিংটাও শেষ হয়েছে ভীষণ তাড়াতাড়ি। আর 'চারুলতা' ফিফটি এইট ফিফটি নাইনের পর—যখন প্রথম চিত্রনাট্য করবার কথা হয়—ইণ্টেরেস্টেড হ'লেও। তখন কিন্তু (অন্তর্বর্তীকালে) 'চারুলতা' সম্বন্ধে একবার চিন্তাও করিনি। আর তারপর হোয়েন ফাইন্যালি দ্য অপরটুনিটি কেম, তখন সেই পুরোনো চিত্রনাট্যের অনেক বদল হ'য়ে গেছে।—এবং ছবিটা শেষ অবধি খুব তাড়াতাড়ি তুলেছি। অবশ্য 'পথের পাঁচালী'টা স্বতন্ত্র ব্যাপার। ওটা বহুদিন মাথার মধ্যে

রয়েছে, নানারকম ভেবেছি, এবং এটাও ঠিক 'পথের পাঁচালী' একমাত্র ছবি যার থেকে বহু জিনিশ বাদ গেছে ফাইন্যাল এডিটিঙে। আজকাল কাজটা আমার অনেক বেশি ডিসিপ্লিনড্ হ'য়ে গেছে, তখন আমি লেংথের আন্দাজটা ঠিক পেতাম না, ওটা বড়ো কঠিন, এক্সপিরিয়েন্স থেকে আসে। এই চিত্রনাট্যতে কতো বড়ো ছবি হবে, সেটা একটা আন্দাজের ব্যাপার। অবশ্য আরেকটা কথা ছিলো—বহু সিকোয়েন্স আমি শেষ করতে পারিনি, দু একটা সিকোয়েন্স তার মধ্যে আছে, যেগুলো হ'লে ছবিটা এনরিচ্‌ড হ'তে পারতো।

'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত'

প্র. 'পথের পাঁচালী' সম্বন্ধে আজকে কী আপনার মনে হয় ছবি হিশেবে?

স. আমার তো আগে কোনো ইমোশনই জাগতো না—ওটা নিয়ে এতো বেশি ঘাঁটাঘাটি হয়েছে। যখন পাশের দর্শককে দেখেছি কান্নাকাটি করতে, তখন মনে হয়েছে যে কিছু একটা আছে। কিন্তু বছর চারেক আগে দেখে ইভন আই ওয়াজ মুভড অলমোস্ট টু টিয়ার্স। কিন্তু ঐ সেকেণ্ড হাফ—ফার্স্ট হাফটা আমার কাছে খুব দুর্বল এবং দুর্বলতার একটা কারণ হচ্ছে ল্যাক অব এক্সপিরিয়েন্স, তাছাড়া তাড়াহুড়ো, এডিটিং ইত্যাদি। মিক্সিঙে গোলমাল আছে—মিউজিক যথেষ্ট ছিলো না। তবে একটা কথা বলা যায়। 'পথের পাঁচালী'র স্টোরি টেলিং মেথড যেখানে সরল বা লিনিয়ার ছিলো সেখানে ডিটেইল দিয়ে এনরিচ করেছি —কনট্রাপন্টাল গোছের বুনোন রেখে যাওয়া হয়েছে। দুর্গা বা ইন্দির ঠাকরুনের মৃত্যুকে বড়ো করতে হয়েছে। ম'রে গেলে যেন লোকে চিনতে পারে বা মনে রাখতে পারে।

প্র. আর 'অপরাজিত'র মান সম্বন্ধে আপনার কী মনে হয়?

স. 'অপরাজিত'র চিত্রনাট্যে যা ছিলো তার সিক্সটি পার্সেন্টের বেশি আমি এচীভ করতে পারিনি। তার অনেকগুলো কারণ। একটা খুব পিকিউ-লিয়ার—টেকনিক্যাল। তখন একটা ক্যামেরা এসেছিলো, অ্যারিফ্লেক্স, যেটা এখন আমরা ব্যবহার করি। তা, সে-অ্যারিফ্লেক্স পুরো বেনারসের শুটিঙে অনবরত জ্যাম করতো এবং একটার বেশি দুটো 'টেক' নেওয়া কোনো শটেই সম্ভব হচ্ছিলো না। ফলে শুটিঙে ত্রুটি আছে ভীষণ। তারপরে এডিটিং স্টেজটা—যেটা অনেক ক্ষেত্রেই আমার ছবির হয়েছে—

এডিটিং স্টেজে হঠাৎ দেখতে পাচ্ছি রিলিজের ডেটটা কাছে এসে গেছে; ফলে তাড়াহুড়ো হয়েছে। আরো একটা ব্যাপার, আরো দেড়া মিউজিক দেওয়া উচিত ছিলো রবিশংকরের, [কম মিউজিকের] ফলে ব্ল্যাংক মোমেন্ট্স রয়েছে, যাতে ছবিটার মধ্যে একটা মন্থরতা এসেছে। তবে 'অপরাজিত'র মনস্তত্ত্বের দিকটা—বিশেষ ক'রে গ্রোয়িং অপু ও তার মা-র সম্পর্কটা আমার কাছে খুব সাকসেসফুল মনে হয়।

প্র. আপনার কি মনে হয় ছবিটা খুব ইন্টিগ্রেটেড ওয়াৰ্ক হয়েছে ?

স. না, দুটো আলাদা ছবি। এইসব ছবির একটা ডিসঅ্যাডভানটেজ—যেটা প্রথম থেকেই আমাকে চিন্তিত করেছে—সেটা হ'লো এই যে, যে-ছবিতে একটা চরিত্র ছেলেবেলার অবস্থা থেকে একটা বড়ো অবস্থায় চ'লে যায়, সেখানে অটোমেটিক্যালি সে আর সে-ছেলে থাকে না। কাজেই একটা ল্যাক অব ইউনিটি এসে পড়ে ছবিতে ভীষণভাবে।

বিদেশী চলচ্চিত্র দেখার অভিজ্ঞতা

প্র. আচ্ছা, ৪৩-৪৫ সালে আপনি যখন মার্কিন ও বিলিতি ছবি নিয়মিত দেখে চলেছেন, তখন এ-দুটি দেশের বাইরে চলচ্চিত্রের যে পরিণত জগৎ রয়েছে, তা জানতেন নিশ্চয়ই? জানতেন যে যুদ্ধের আগে জার্মানি কিংবা রাশিয়ার চলচ্চিত্রে বিরাট ব্যাপার ঘ'টে গেছে ?

স. রাশিয়ান ছবি দেখার সুযোগ আমরা তখন খুব পেতাম কলকাতায়। যুদ্ধের টাইমটাতে প্রচুর দেখেছি, 'আলেকজান্ডার নেভস্কি', 'ইভান দ্য টেরিবল' পার্ট ওয়ান—পার্ট টু পরে আমি প্যারিসে দেখি—তারপর 'চাইল্ডহুড অব ম্যাকসিম গোর্কি', 'মাই ইউনিভার্সিটিজ', ভ্যাসিলেভস্কার 'রেনবো' নিয়ে ডনস্কয়ের ছবি।

প্র. আচ্ছা, ডনস্কয়ের নামটা তুললেন ব'লে জিগগেশ করছি। অনেক, অনেক পরে যখন আপনি 'পথের পাঁচালী' ট্রিলজি তুলেছিলেন তখন ডনস্কয়ের কোনো সিকোয়েন্স, কোনো দৃশ্য, বা কোনো মুহূর্ত বা মুড আপনার মনের মধ্যে ফিরে-ফিরে আসেনি ?

স. একেবারেই না।

প্র. জার্মান এক্সপ্রেশনিস্ট ছবি ঐ যুগে কিছু দেখেননি ?

স. হ্যাঁ, কলকাতায় ঐ যুগে এসেছিলো—'ব্লু এঞ্জেল' দেখেছি—আলেয়াতে—'ক্যামেরাডশ্যাফ্‌ট'। 'ক্যা মে রা ড শ্যা ফ্‌ ট'-এর কলকাতায় রান

হয়েছে নাইণ্টিন থার্টি-টুতে, যখন একেবারে ওখানে রিলিজ করেছিলো। 'মেট্রোপলিস', 'ড. ম্যাবুজ', সব কলকাতায় কমার্শিয়্যালি শো করা হয়েছে—তখন অবশ্য আমরা খুব ছেলেমানুষ। আর পরে, চল্লিশের সময়ে, সে-সব আর এখানে দেখিনি। তখন আমরা ফ্রিট্স ল্যাঙের আমেরিকান ছবিই দেখেছি। জার্মান ছবি তখন কালে-ভদ্রে এক-আধটা এসে পড়েছে। ফরাশি ছবি কিছু-কিছু মাঝে-মধ্যে আসতো, জুলিয়্যাঁ দুভিভেয়া।

প্র. আচ্ছা, বলা হ'য়ে থাকে যে যুদ্ধপূর্ব ইংরেজি, বিশেষ ক'রে মার্কিন ছবি, একটা আলাদা জাতের ছবি, সমসাময়িক রুশ বা জার্মান বা ফরাশি ছবিকে যতোটা সহজে 'আর্ট' ব'লে মেনে নিয়েছি, এদের ততো সহজে মেনে নিইনি। বলি, এদের ফোটোগ্রাফিটা এখানে অসাধারণ, ওখানে অভিনয়টা অপূর্ব—পল মুনি কি কোলম্যান যা করেছেন—মোট কথা শিল্প-সংজ্ঞাটা কিন্তু এদের সহজে দিইনি। তা, আপনি যখন ঐ যুগে ছবি দেখেছেন, একদিকে মার্কিন মহারথীরা, অন্যদিকে আইজেনস্টাইন, পুডভকিন

স. আইজেনস্টাইন, পুডভকিন আলাদা লেভেলে চ'লে গেলেন। এঁরা ভীষণ সীরিয়াস আর্টিস্ট ছিলেন, এঁদের সেট-আপটাই আলাদা ছিলো। কিন্তু আমার মনে হয়েছে, আমেরিকায় কমার্শিয়্যাল সেট-আপ-এ কিছু-কিছু এমন উঁচুদরের জিনিশ সৃষ্টি হয়েছে, সে-রকম পৃথিবীর আর কোথাও হয়নি। যেমন কিছু ওয়েস্টার্ন, 'ওয়াগনমাস্টার' বা 'স্টেজকোচ'—এগুলো আমার অত্যন্ত উঁচুদরের শিল্প ব'লে তখনই মনে হয়েছিলো। তখন কলকাতায় আমেরিকান ক্যাম্প থাকার দরুন বহু ছবি বিদেশে দেখানোর আগে এখানে দেখানো হয়েছে। কিছু-কিছু আমেরিকান জি. আই. এসে বলেছে—আমি তখন রাসবিহারী অ্যাভিনিউতে ছিলাম—আজ একটা নতুন ছবি এসেছে, দেখতে যাবে? এভাবে কিছু ফোর্ড, কিছু বিলি উইল্ডার দেখেছি। একটা লুই মাইলস্টোনের ছবি, 'ওয়ক ইন দ্য সন'—আমার কাছে মনে হয়েছিলো লিট্ল মাস্টারপীস। এটা তখন ইংল্যান্ডে রিলিজ্‌ডই হয়নি।

প্রথম ইউরোপযাত্রা

প্র. আচ্ছা, আপনি তো ছবি তোলা শুরু করার আগেই প্রথমবার বিলেত গিয়েছিলেন, ডি. জে. কিমারের হেড-অফিসে কাজ করবেন ব'লে, তা-ই নয়?

স. হ্যাঁ, তবে ছ-মাসের জন্য গেলেও ওখানে একমাসও থাকিনি। গিয়ে দেখি, ওদের অফিস আমাদের কলকাতার অফিসের চেয়েও অনেক ছোটো —সে এক হাস্যকর ব্যাপার। সেখানকার আর্ট ডিরেক্টর—এক মি. বল— আমি সপ্তাহ তিনেকের মধ্যে ডিসকভার করলাম, আমার কাজগুলো তিনি নিজের ব'লে চালাচ্ছেন। দেন আই হ্যাড এ ভায়োলেণ্ট রাও উইথ হিম অ্যান্ড আই লেফট। তারপর আমি নিজে বেনসন ব'লে একটা ফর্ম আছে, সেখানে আসি। চার মাস ঐ বেনসনে কাজ করলাম। তারপর একমাস আমরা ঘুরেছিলাম—আমি আর আমার স্ত্রী। জাস্ট বিয়ে করার কিছুদিন পরেই গিয়েছিলাম তো—প্যারিস, সাতদিন ভেনিসে ছিলাম, সাতদিন সল্‌স্‌বুর্গে ছিলাম

প্র. কোন সালে আপনি বিয়ে করেন ?

স. ফর্টি-নাইনে, অক্টোবরে। ফিফটির এপ্রিলে আমি বিলেত যাই। কিন্তু বিলেত যাবার আগেই রেনোয়ারের সঙ্গে আলাপ হ'য়ে গেছে।

প্র. এখানে যখন উনি 'দ্য রিভার' তুলছিলেন ?

স. যখন লোকেশন নির্বাচন করতে এসেছিলেন, এবং বিলেত যাবার আগেই ও'র ওপর 'সিকোয়েন্স'-এ আর্টিক্‌ল পাঠিয়ে দিয়েছি।

প্র. হ্যাঁ, সে-প্রবন্ধ তো আপনার আমরা অনেকেই পড়েছি। একদা ক্যারেল রাইজের মুখে শুনেছিলাম যে রাইজ প্যারিসে গিয়ে রেনোয়ারের ওপর প্রবন্ধ লিখে এনে দেখলেন যে আপনার প্রবন্ধটা আগে পেঁছে গিয়েছে। এবং সেটা এতো ভালো লাগলো ও'দের যে সেটাই ছাপা সাব্যস্ত হ'লো—রাইজ নিজেরটা চেপে গেলেন।

স. আচ্ছা ? আমি সে-কথা জানতাম না। আমি তিনটে সাবজেক্ট অফার ক'রে লিন্ডসেকে চিঠি লিখি—রেনোয়ার ইন ক্যালকাটা, মিউজিক ইন ফিল্ম্‌স, আরো কী যেন একটা।

গুপী গাইন বাঘা বাইন

প্র. 'গুপী গাইন' নিয়ে আরো দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করি। আপনি বোধহয় লক্ষ ক'রে থাকবেন যে সাধারণত আমাদের দেশের চিত্র সমালোচনায় আপনার ছবির মধ্যে গল্পটাকে গল্প হিশেবে না-নিয়ে তার গূঢ় তাৎপর্য অন্বেষণে সবাই ব্যস্ত।

স. সেটা প্রায় গা সওয়া হ'য়ে গেছে, তবে এটাতে একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে ব'লে মনে হচ্ছে।

প্র. এই যে ধরুন দুটি দেশ, একটা যুদ্ধবাদী একটা শান্তিপ্রিয়—চ্যাপলিন যেমন 'গ্রেট ডিক্টেটর'-এ স্পষ্টই একটা ডায়াট্রাইব লঞ্চ করেছিলেন, আপনি এখানে 'হল্লা চলেছে যুদ্ধে' গানটির সঙ্গে ক্যামেরা পাস ক'রে দিয়ে কমিক্যাল প্রোপোরশনে দেখালেন, তার সঙ্গে কোনো অ্যান্টি-নার্টাসি ফীলিং আছে কিনা, এ-নিয়ে নানা কথাবার্তা হয়েছে।

স. হ্যাঁ জানি। কিন্তু একটা কথা তো মনে রাখতে হবে যে যখন ১৯১৫-তে গপ্পোটা বেরিয়েছিলো, তখনো তাতে দুটো রাজ্য ছিলো—একটা শান্তিপ্রিয়, একটা যুদ্ধপ্রিয় রাজ্য। তাদের মধ্যে সেই যুদ্ধটা থামানো হ'লো, তারপর শান্তি এলো, তারপর দুই রাজার মিলন হ'লো। মূল গল্পটাই তা-ই। এখন আজকের দিনে সে-গল্প পড়লে স্বভাবতই সাধারণ লোকের মনে অনেক রাজ্যের সঙ্গে আইডেণ্টিফাইড হ'য়ে যেতে পারে। আমি কিন্তু এসব কিছু ভেবে করিনি।

প্র. 'গু গা বা বা' বিষয়ে অনেকে অভিযোগ করেন যে এর শুরু ফ্যান্টাসিতে, শেষ ফেব্‌লে। প্রথমে আজগুবি গল্পের লজিকে চলেছে, কিন্তু মাঝখানে বক্তব্য বা নীতিকথা এসে পড়ায় কাহিনীটি দ্বিধাবিভক্ত হ'য়ে গেছে। গুপী-বাঘার গানগুলিও তার প্রমাণ।

স. গুপী-বাঘা যখন কথা বলছে, তখন তাদের মধ্যে কোনো বক্তব্য আছে বলা যায় না। শুধু ফংশন্যাল কথাবার্তা ব'লে গেছে। শুধু যখন গান গেয়েছে, গুপী তখন প্রায় গুবাদুরের একটা ফংশন মেনে চলেছে আর কী! কমেন্ট করেছে সিচুয়েশনের ওপর। [আর ফ্যান্টাসি এবং ফেব্‌লের কথা যদি বলেন] দুটোতে খুব একটা ডিমারকেশন করা হয় কিনা আমি ঠিক জানি না। আমার মনে হয় সব চাইতে ভালো…কোনো ক্যাটিগরিতে না ফেলা—জজ ইট অ্যাজ ইট ইজ। সেটাই আমার মনে হয় সব চাইতে ভালো। ফ্যান্টাসি, মানে ফেব্‌লের মধ্যেও যদি অলৌকিক ঘটনা, ম্যাজিক ইত্যাদি থাকে, তাহ'লে দুটো জিনিশই আবার—মানে—ন্যাচারালি—আমাকে গল্পটার মূল কাঠামোটা গ'ড়ে তারপর তো এগোতে হয়েছে। সেখানে গুপী একটা গায়ক চরিত্র হচ্ছে—তার গানগুলো আমাকে লিখতে হচ্ছে এবং তাহ'লে গানগুলো লিখলে তার বক্তব্য কী হবে সেটা স্বভাবতই এসে যাচ্ছে। এখন, একটা যুদ্ধে একটা সৈন্যদল অগ্রসর হচ্ছিলো, সেখানে তারা এসে গান গেয়ে থামাচ্ছে। এখন, সেখানে তো 'দেখো রে নয়ন মেলে জগতের কী বাহার' সে-গান দিতে পারি না। কাজেই সেখানে স্বভাবতই একটা অ্যান্ট, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট গান দিতে হয়েছে। এখন, সেখানে আস্তে-আস্তে ঐ জিনিশটা ইভল্‌ভ করেছে। তাহ'লে যুদ্ধ সম্বন্ধে একটা কমেন্ট

করুক না।...জিনিশটাকে আরো নাটকীয়, আরো রেলেভ্যাণ্ট, করবার জন্য, আরো পয়েণ্টেড করবার জন্য—যেমন মন্ত্রী যখন তাদের গ্রেপ্তার করার হুকুম দিলো—তখন, যখন মন্ত্রীকে 'ওরে থাম, থাম মন্ত্রীমশাই, ষড়যন্ত্রী মশাই' ব'লে গান গাইলো, তখন সেখানে মন্ত্রী সম্পর্কে একটা কমেণ্ট তাকে করতেই হয়েছে—মানে, সেই সিচুয়েশন অনুযায়ী তাকে গান করতে হয়েছে। স্বভাবতই সেটা কমেণ্টের পর্যায়ে এসে পড়েছে।... কিন্তু গানটা যখন আসছে, জিনিশটা স্টাইলাইজেশনের পর্যায়ে উঠে যাচ্ছে —যখনই সেখানে অপেরাটিক ফর্ম এসে যাচ্ছে বা যাত্রার ফর্ম এসে যাচ্ছে, বা ত্রুবাদুরের ট্রেডিশনটা চ'লে আসছে, তখনই তারা কমেণ্ট করছে।

\+ \+ \+

প্র. আচ্ছা 'গুপী গা বা বা'-ই তো আপনার প্রচলিত অর্থে প্রথম মিউজিক্যাল ছবি, যার আবহ-সংগীত আপনি রচনা করেছেন? এই সংগীতের ক্ষেত্রে আপনার মূল লক্ষ্য কী ছিলো?

স. খানিকটা লক্ষ্য ছিলো প্রথমত লোকসংগীত তো বটেই। সব মিলিয়ে ভারতীয় মেজাজটা—বাংলার গ্রাম্য মেজাজটা রাখা। কেননা গুপী যখন বাংলাদেশের ভূতের রাজার থেকে বর পেয়েছে তখন গানের মধ্যে বাংলা ভাষাটা থাকলে ক্ষতি কী? কিন্তু দুটো গান বলতে পারেন যে রাগের ওপর বেস করা, একটা তো ভৈরবী প্রথমে আছে—তারপর 'ওরে বাবা দ্যাখো চেয়ে'। ওখানে আবার মডিউলেশন আছে, প্রথম দিকটা ভূপালী, পিওর ক্ল্যাসিক্যাল রাগের ওপর বেস করা। সেকেণ্ড পোরশনে গানটা [যখন] মডিউলেট করছে সেখানে মেজাজটা আবার ফোক-এর দিকে চ'লে যায়—'ওরে হাল্লা রাজার সেনা, তোরা যুদ্ধ ক'রে করবি কী তা বল', এই অংশটায়। এখানে গানটা দুটো সেকশনে রয়েছে। তারপর ন্যাচার্যালি মহারাজকে যখন প্রথম গান শোনাচ্ছে, তার মধ্যে প্রথম লাইনে একটা গ্রাম্য ফোক সং—মানে কোনো এমন গান একটাও নেই যেটা একেবারে চেনা-জানা, ফোক সঙের সুর বসানো। ফোক-এর একটা বেসিক মেজাজকে ধরা হচ্ছে কতোগুলো ছোটোখাটো কাজের মধ্যে দিয়ে।

প্র. ভৈরবী কোন গানটির কথা বলছেন?

স. প্রথম গানটা একেবারে। 'দেখো রে নয়ন মেলে।.. [গুপী] তো প্রথম বলেওছে—আমি তো একটাই গান জানি, সকালের গান, ইত্যাদি। অবশ্য সকালের গানটা প্রথমে একেবারে চেনাই যায় না। যখন প্রথম গাইছে তখন সেটা ভৈরবী কি [অন্য] রাগ বোঝবার কোনো উপায়

নেই ।···সে বলছে ভৈরবী, কিন্তু যেটা গাইছে সেটা বোঝবার উপায় নেই। তারপর যখন বর পেয়ে গাইবে তখন পুরো ভৈরবীর মেজাজটা যাতে প্রকাশিত হয়—যে-জিনিশটা আয়ত্তের বাইরে ছিলো সেটা তখন আসছে এবং তারপরে···একটা গানে আমি একেবারে পুরো কর্ণাটকী মেজাজ এনেছি, প্যারোডিস্টিক চালে বলতে পারেন, যেটা 'ওরে বাঘা রে, গুপী রে'—যেখানে লাস্টে ভারতনাট্যমের নেক-মুভমেণ্ট করতে-করতে ওরা পালায় আর কী। সেটা পুরো কর্ণাটকী, প্যারোডিস্টিক বলতে পারেন। অন্য কোনোটা [সে-রকম] নয়। তারপর অবশ্য ইনস্ট্রু-মেণ্টেশনে অর্কেস্ট্রেশনে পুরো লোকসংগীত একটা শুধু আছে, যেটা জেলে ব'সে-ব'সে গাইছে, যেটাতে রাজাদের নাচ থেমে যায় আর কী—'দেখো রাজা—দুঃখ কিসে যায়।'···সে-গানটাতে শুধু আমি দুটো ইনস্ট্রুমেণ্ট ইউজ করেছি—একটা দোতারা আর একটা ভায়োলিন। ভায়োলিনটাকে বাজানো হয়েছে একটা পূর্বঙ্গের ফোক ইনস্ট্রুমেণ্টের মতো ক'রে—সারিন্দার মতো ক'রে। আর সব গানে, যেহেতু একটা বেশ জমকালো অ্যাটমসফিয়ার আছে, আমি তার সঙ্গে যেতে হবে ব'লে বেশ হেভিলি অর্কেস্ট্রেটেড করেছি। বেশ দিশি-বিলিতি মেশানো যন্ত্র আছে, ভায়োলিন, চেলো সবই আছে—তার সঙ্গে দোতারা-একতারা।··· এটা আমরা অবশ্য অনেকদিন থেকেই চেষ্টা করছি। আমার মনে হয় যে মিউজিকটা যদি এমন একটা বেসিস থেকে ধরা যায়, এমন ফণ্ডামেণ্ট্যাল থেকে, যেখানে আমি দিশি-বিলিতি একেবারে ইচ্ছেমতো মেশাতে পারি এবং মেশানো সত্ত্বেও সেটা এসেনশিয়্যালি মিউজিকই থেকে যায়।

প্র. মূল ভারতীয় সংগীতই থেকে যায় ?

স. মূল মেজাজটা ভারতীয় থাকছে। তার মধ্যে একেকটা গানে, যেমন 'মহরাজা তোমারে সেলাম', এই গানটায় একটা জিনিশ করা আছে, যেটা কম ভারতীয় ব্যাকগ্রাউণ্ড গানের [আছে]—একেবারে এক কী থেকে আরেকটা কী-তে চ'লে গেছে। দেয়ার ইজ এ মডিউলেশন···কিন্তু সেটা এমন স্বচ্ছন্দে গেছে ব'লে আমার মনে হয় যে সেটাকে কখনো বিলিতি মনে হয় না। যেহেতু গানের মুডটা সেখানে চেঞ্জড হচ্ছে। এবং মডিউলেশনটা সেখানে জাস্টিফাইড হ'য়ে যাচ্ছে।

\+ \+ \+

প্র. দু-একজন বলেছেন, ঐ যে গুপী প্রথম গানটা গাইলো রাজার সামনে এসে, 'মোরা বাংলা দেশের থেকে এলাম'—এর আগে তো আপনি

কোনো বিশেষ দেশ, পৃথিবীর কোনো বিশেষ সময়ের সঙ্গে চিহ্নিত করছিলেন না আপনার রাজাকে, এই মুহূর্তে

স. প্রথম দৃশ্যটা কি বাংলা দেশ ব'লে মনে হয় না ? ঐ যে বামুন পন্ডিতের দল ব'সে পাশা-টাশা খেলছে, ওটা কিন্তু আমি ভীষণভাবে বাংলা দেশ ভেবে করেছি।

প্র. কিন্তু আমি বলছি, যেমন ধরুন আপনি ঝুন্ডি-শুন্ডি এই ধরনের নামগুলো তো ব্যবহার করেছেন।

স. উপেন্দ্রকিশোরে শুন্ডি এবং হাল্লা ছিলো। তবে ঐ শুন্ডি—ঐ কনফিউশনটা ছিলো না।

\+ \+ \+

প্র. গুপী এবং বাঘা যখন গান গাইতে আরম্ভ করলো, সঙ্গে-সঙ্গে নিজেকে ইনট্রোডিউস করলো, আমরা বাংলা দেশ থেকে এলাম। হুন্ডি শুন্ডি ঝুন্ডি কোনোটাই কোনো দেশ কোনো সময়ের ব্যাপার নয়। সেটা করলেন কেন ?...আমার মনে হয়েছে, বাংলা দেশের চাইতেও যেটার উপর জোর দিয়েছেন, সেটা বাংলা ভাষা। ঐ ভাষার কথাটা বারবার আসছে।

স. হ্যাঁ, ভাষার কথাটা এইজন্য এনেছি, কেননা তার পরের সেনটেন্সেই বলা হয়েছে যে আমরা যদিও বাংলা ভাষা ছাড়া অন্য ভাষা জানি না, কিন্তু আমরা এমন একটা ভাষা জানি যেটা দেশ-কাল-পাত্রের ওপরে। যে-ভাষাটা ইউনিভার্স্যাল। সেটা হচ্ছে গানের ভাষা। এইটে এস্টাবলিশ করতেই আমি বাংলা ভাষার প্রসঙ্গটা এনেছি।

প্র. এর সঙ্গে আপনি কি ঐ শুন্ডিতে যে কথা বলতে পারে না, তার কোনো যোগ মনে-মনে ভেবেছিলেন ? যে, এরা এই ভাষায় গানটা করছে এবং বলছে যে আরেকটা ভাষা আছে উঁচুস্তরের

স. নিশ্চয়ই, একশোবার। তারা তো জানে না যে এখানে লোকেরা কী ভাষা বুঝবে, কাজেই কথা বলার ব্যাপারে তাদের এমনি একটা মুশকিল আছে। কিন্তু গান, গান জিনিশটার এমন একটা এপীল আছে, সেটা দেশোত্তর, কালোত্তর।...সব সময় যে-প্রব্লেমটা হয় : এই যে সভায় গান গাইবে সেটা কী বিষয়ে গাইবে। এটা একটা ভীষণ প্রব্লেম। গল্পে তো সেটা বলা হয়নি। সেটা তৈরি করতে হবে। না, এই ধরনের—প্রথমে একটা হিউমিলিটির ফীলিং—আমরা বাংলা দেশ থেকে এলাম, আমরা শাদাসিধে মানুষ। আমরা দেশে-দেশে যাই, আমাদের ভাষা তো

তোমরা বুঝবে না। কিন্তু কথা যখন বলবে তখন হয়তো না-ও বুঝতে [পারো], কিন্তু আশা করি আমরা গান যখন গাইবো তখন না-বুঝলেও তোমাদের কান দিয়ে হৃদয়ে প্রবেশ করবে। এইটুকু। এইজন্য প্রথমে গানের থীমটাকে বের ক'রে নিতে হয় সব সময়। এই যে গান গাইবে—কী বিষয়ে গান গাইবে ? ওটা তো ভীষণ একটা প্রব্লেম মিউজি-ক্যালে। অপেরাতে সুবিধে আছে। অপেরাতে গানের মধ্যেই প্লটটাকে এগুতে হচ্ছে। এখানে তো তা নয়। এখানে প্লট কিন্তু গান গেয়ে হচ্ছে না। ইনডিপেণ্ডণ্টলি এগোচ্ছে।··· এইটেই হচ্ছে প্রব্লেম। এটা আমাকে আর কখনো ফেস করতে হয়নি। এটা এখানেই হ'লো এবং এইভাবেই আমার মনে হ'লো অনেক ভেবে-ভেবে। কেননা কোনো মডেল সত্যি ক'রে পাওয়া যায় না। এক আমেরিকান, সত্যি বলতে আমেরিকান মিউজিক্যাল কমেডি ছাড়া কোনো মডেল নেই।

প্র. 'রেড শুজ' জাতীয় কিছু ?

স. এনিথিং। এমন কি 'সাউণ্ড অব মিউজিক'-ও অনেক ভালো।

\+ \+ \+

প্র. আচ্ছা, আপনি দেমি-র 'লে পারাপ্লুয়ি দ্য শেরবুগ" ছবিটা দেখেছেন ?

স. আমি দেখিনি ওটা। আমার একটা রেজিসট্যান্স আছে। আমি নিশ্চয়ই—আমি স্বীকার করছি, আমি না-দেখেই বলছি নিশ্চয়ই খুব স্ট্রাইকিং ছবি হবে। কিন্তু একেবারে পুরো গল্পটা গানে বলা···আমি সেজন্য সুযোগ গেলেও দেখিনি আর কী।

প্র. আমারও গোড়াতে রেজিসট্যান্স ছিলো··· ইন ফ্যাক্ট দেখেছিলাম অনেক পরে। সেটা হয়েছিলো ঐ পুচ্চিনির 'মাদাম বাটারফ্লাই' শুনে এবং প্রথম দেখে অপেরাকে আমি নিতে পারিনি। আমার মনে হয়েছিলো

স. অপেরা আমি [নিতে] পারি, স্টেজে পারি—নিশ্চয়ই পারি। অপেরা বা ফিল্মে গিয়ে কোনো—তবে [এখানে]···ভয়ানক মুনশিয়ানা থাকলে তবে এ-জিনিশটা উৎরোয়। সেই পরিমাণে আছে কিনা জানি না। হয়তো আছে—থাকতে পারে। অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন শিল্পী হ'তে হবে।···

প্র. আচ্ছা আপনার যে 'গুপী গা বা বা'-র ভূতের বর দেবার দৃশ্য—তাতে যে-নাচটা রয়েছে, এটা সম্পর্কে দু-একজনের বক্তব্য যে

স. লম্বা হয়েছে।

প্র. না—টু কালচারস, তার একটা সর্ট অব সারটোরিয়্যাল—দেখালেন—ফ্যাশেস অব টু কালচারস—টিকিওয়ালা ভূতেরা এবং সেই প্রসঙ্গে ভূশণ্ডির মাঠের ভূতেরা। তারা মিলে লড়াই করছে

স. না, তারা কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করছে না, এটা ভুল ধারণা। তারা নিজেদের মধ্যে মারামারি করছে।···

প্র. হ্যাঁ, নিজেদের মধ্যে লড়াই করছে—না, আমি সেই আসপেক্টটা বলছি না। আমি বলছি যে, এই যে লড়াই করছে—তার মানে একটা বিশেষ সময়ে চিহ্নিত করা হ'লো। অথচ সময় হিশেবে ১৯১৫-তে লেখা হ'তে পারে। আপনার ছবির জেনারেল ডমিন্যান্ট ইম্প্রেশন হচ্ছে ইট ইজ অ্যাবাউট এ টাইমলেস ইউনিভার্স অ্যান্ড ইট ক্যান বি এনজয়েড অ্যাট দ্য সেম লেভেল, সে বাই এ ট্যাসিটর্ন জ্যাপানীজ অ্যান্ড এ ভোল্যাটাইল ওয়েস্টার্নর ইন দ্য সেম মেজার অ্যাজ ইট ইজ এনজয়েড বাই আস।··· আর সেই মুহূর্তে যখন আপনি একটা বিশেষ সময়ের কতকগুলি জিনিশ ইমপ্লাই করলেন—বিরাট কোনো বক্তব্য নয়—একটা বিশেষ সময়কে চিহ্নিত করলেন—পোস্ট নাইনটিন্থ সেনচুরির একটা সময়ের বাংলা দেশের বা ভারতবর্ষের একটা কনটেক্সটে, তখন ইউনিভার্সেলিটিটা একটু

স. পোস্ট নাইনটিন্থ সেনচুরি কী ক'রে বলছেন জানি না—সাহেব সকলেই তো এইটিন্থ সেনচুরির

প্র. মানে পোস্ট এইটিন্থ সেনচুরির

স. হ্যাঁ, এখন, আমার মনে হয়েছিলো যে ভূত—আবার ঐ প্রশ্নটা আসে—গল্পে আছে ভূতেরা এসে নাচলো—সেটাকে যে কনক্রিটাইজ করতে হবে—এখন ভূতেদের এ-রকম কনভেনশন আছে যে···ভূতের কুলোর মতো কান, মুলোর মতো দাঁত, কিসের মতো পিঠ যেন আছে না? এখন সেটা আমার কাছে—সেটা খুব বেশিক্ষণ টানা যাবে ব'লে আমার মনে হয়নি। কেননা তাদের নাচের কোনো কনভেনশন আছে ব'লে আমি জানি না। একরকম ভূতের নৃত্য হয় সেটা নিয়ে খুব একটা আর্টিস্টিক কিছু করা যাবে ব'লে আমার মনে হয়নি। তখন আমি ভূতটা নিয়ে অন্যরকমভাবে চিন্তা করতে আরম্ভ করলাম। আমি বললাম যে যারা মরেছে অ্যাকচুয়ালি, তাদের যদি ভূত হয়—অ্যাকচুয়ালি কতকগুলি ক্লাস অব পিপল যারা অবভিয়াসলি বাংলা দেশে ছিলো—রাজা-রাজড়া তো ছিলোই একেবারে বৌদ্ধ আমল থেকে এবং তারপর চাষাভুষোও ছিলো—আর সাহেবরা তো প্রচুর আছে—বীরভূমে যেখানে আমরা শুটিং করেছিলাম তার মাইল দশেকের মধ্যেই কবরখানা এবং তারা বহু মরেছে অল্প বয়েসে আর কী—এবং আরেকটা জাস্ট ফর এ

ভিজুয়াল কণ্ট্রাস্ট যদি একটা মোটাদের দল করা যায়? সেখানে কারা-কারা থাকবেন? না, এ-রকম ওয়েলফেড পিপ্‌ল—বানিয়া-টানিয়া, ফলারের বামুন-টামুন হ'লো, কিছু পাদ্রি—এ-রকম নিয়ে একটা যদি গ্রুপ করা যায়। তখন চারটে ক্লাসে পরিণত হ'লো জিনিশটা—একটা হচ্ছে রাজাদের, একটা হচ্ছে চাষাদের, একটা হচ্ছে সাহেবদের, একটা হচ্ছে মোটাদের মানে হৃষ্টপুষ্ট ব্যক্তিদের ভূত। চারটে যখন হ'লো, তখন ইমিডিয়েটলি আমার একটা ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিক্যাল ফর্মের কথা মনে হ'লো যেটা আমি বার দুই শুনেছি এমনিতে—রেডিওতে অনেক বার শুনেছি। চাক্ষুষ দেখেছি আমি যখন দিল্লিতে ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল হয়, তখন ডেলিগটদের জন্য একটা পারফর্ম্যান্স দিয়েছিলো—কর্ণাটিক, সাউথ ইণ্ডিয়ান পারকাশন ইনস্ট্রুমেণ্ট 'চালবাদ্যকাচেরি' বলে একে—বারো রকম পারকাশন—মৃদঙ্গ, ঘট্টম মানে হাঁড়ি, খঞ্জিরা আর মুড়শুং, মানে একটা ছোটো যন্ত্র মেঁয়াও-মেঁয়াও ক'রে বাজে। এই চারটে নিয়ে অসাধারণ একটা জিনিশ ওরা করে, যেটা পৃথিবীর কোনো মিউজিকে আছে ব'লে আমার মনে হয় না—একেবারে ইউনিক। শুধু পারকাশন নিয়ে গান ছাড়া এ-রকম কোয়ার্টেট আর নেই। তখন আমি ভাবলাম, এই চারটে শ্রেণীর ভূতকে এই চারটে যন্ত্রের সঙ্গে যদি আইডেণ্টিফাই করা যায়। মৃদঙ্গ হ'লো রাজার, যেহেতু মৃদঙ্গটা রীয়্যালি ক্লাসিক্যাল ইনস্ট্রুমেণ্ট। তাই নাচের ফর্মটা একেবারে ক্লাসিক্যাল রাখা হ'লো। খঞ্জিরা হ'লো চাষাভুষোর—একেবারে চাষাভুষো এবং তাদের একটু সেমি-ফোক ধরনের করা হ'লো। সাহেবদের জন্য ঘট্টম রাখা হ'লো, একটু কটকটে আওয়াজ—একটু রিজিড আওয়াজ। সেইজন্য সাহেবদের অণ্ডার-ক্র্যাঙ্ক ক'রে তোলা হ'লো, অর্থাৎ সিক্সটিন ফ্রেমসে তোলা হ'লো যাতে সমস্ত জিনিশটা একটু উডেন অ্যাণ্ড মেকানিক্যাল হ'য়ে যায়। আর মোটাদের জন্য ঐ মুড়শুং রাখা হ'লো যেটা একটা ফোক ইনস্ট্রুমেণ্ট একেবারে। সে অদ্ভুত—লাস্ট যেটা মোটাদের ভূত—টোয়াং টোয়াং—এ-রকম ধরনের জিনিশ—পারকাশন যন্ত্র—দাঁতে চিপে বাজায়। আচ্ছা, এই ক'রে তারপর ঠিক হ'লো তাদের ফর্মটা কী হবে। তাদের ফর্মটা হচ্ছে ধীরে ঢিমে থেকে আরম্ভ ক'রে, চারটে যন্ত্রই সে-ঢিমে লয়ে বাজলো, আস্তে-আস্তে তারপর মধ্য লয়ে বাজলো—এই করতে-করতে তারা পাঁচটা মুভমেণ্টে লয় বাড়িয়ে একেবারে জলদে পেঁছে যাবে। তারপর ঠিক হ'লো এই যে পাঁচটা মুভমেণ্টের মধ্য দিয়ে এরা যাবে—এরা করবেটা কী? মানে মুভমেণ্টটা বাড়ছে কেন? কেন লয়টা বাড়বে?...তখন ঠিক হ'লো যে এরা [ভূতেরা] আসুক, এরা নাচুক,

এদের দ্বন্দ্ব লাগুক, পরে ভীষণ যুদ্ধ হ'য়ে ম'রে যাক। অটো-মেটিক্যালি একটা ফ্রেনজিতে চ'লে যাচ্ছে জিনিশটা—এই গপ্পো তৈরি হ'য়ে গেলো আমার। ফাইন্যালি আমার মনে হ'লো একটা কোডা মতো দরকার, যেটাতে দে মাস্ট অল বি ইন হারমনি উইথ ইচ আদার—কেননা ভূতেদের ইন্টারন্যাল দ্বন্দ্ব ব'লে তো কিছু থাকতে পারে না, একটা অবস্থা আসবে যখন, তখন মিলনটা সহজেই [ঘটবে], যেটা মানুষের মধ্যে কিছুতেই সহজে হচ্ছে না—সেটা ভূতেদের মধ্যে একটা গানের মধ্য দিয়ে হ'য়ে যাচ্ছে। এই ভাবে পুরো জিনিশটা এমার্জ করলো।

+ + +

প্র. এই সিকোয়েন্সটা [প্রসঙ্গে] আমাদের মনে হয়েছে যে ইউ হ্যাড কভারড নিউ টেরিটরি · চারটে সারিতে ভূতেরা নাচছে···একদিকে শাদা-কালোর ব্যাপার—দ্বিতীয় দিকে চারটে সারিতে তারা নাচছে, তৃতীয় বলা যায় যখন জ্বলছে-নিবছে আলো···ভূতের রাজার চোখ দুটো এবং তারপর গলার শব্দ।

স. আমি নিজে বলতে পারি আমি কোনো ছবিতে কখনো নিজে এ-জিনিশ দেখিনি। কমপ্লীটলি আমার নিজের মাথা থেকে বের করতে হয়েছে। ···আমার একটা ভীষণভাবে, প্রচন্ডভাবে ইচ্ছে এবং চেষ্টা ছিলো একটা নতুন কিছু করবো—কেননা ভূতের ব্যাপারটা ওদের দেশে নেই। ভূত বলতে আমরা যে-জিনিশটা বুঝি, ইন ফ্যাক্ট গোস্ট আর ভূত এক জিনিশ নয় কিন্তু। স্পিরিটস—কোনোটাই না।···[তার ওপর] ভূতের রাজা তো হয়ই না ওদের। কাজেই আই কুড নট ফল ব্যাক অন প্রিসিডেন্টস—কোনো মডেল বা কিছু [ছিলো না]—মানে একেবারে নতুন জিনিশ এবং তারপর যেমন-যেমন মাথায় এসেছে সেগুলি একজিকিউট করতে যা-যা টেকনিক্যাল ইনজেনুয়িটি দরকার সেটা খাটাতে হয়েছে। অনেক সময় প্রত্যেকটির কোনো প্রিসিডেন্ট নেই ব'লে ভেবে বার করতে হয়েছে—যেমন চার সারির ভূত—আমি কথার কথা বলছি—চার সারির ভূত যদি সত্যি ক'রে মানুষকে সাজাতে হ'তো, তাহ'লে আমার একটা তিনতলা বাড়ির সমান উঁচু সেটের দরকার হ'তো—যে-রকম ফ্লোর এখানে নেই, ওদের দেশে হয়তো আছে। অর্থাৎ আমাকে করতে হয়েছে—একবার দু-সারির ফোটোগ্রাফ নিতে হয়েছে—ওপরটাকে মাস্ক ক'রে নিয়েছি। তারপর ক্যামেরার ফিল্মটাকে রিভার্স ক'রে নিয়ে তলাটাকে মাস্ক ক'রে আবার দু-সারির—ঐ একই পজিশনে

ওরা দাঁড়িয়েই নাচছে, কিন্তু ঐ টপ হাফ অব দ্য ফ্রেম—ওদের অকুপাই ক'রে আবার প্রিসাইজ মোমেণ্ট ইন দ্য মিউজিকে আবার জুম ব্যাক ক'রে যেতে হয়েছে। দু-বার—সেটা আমি নিজে গান-বাজনা করি, জানি, অনেকটা বুঝি ব'লে এবং নিজে ক্যামেরা অপারেট করি ব'লে [সম্ভব হয়েছে।]...একটা মিউজিকের একটা জায়গায় দেখবেন শটটা—প্রথমে ক্লোজ আপ যাতে আছে—তারপর বাঁই-বাঁই ক'রে পিছিয়ে দেখা যায় যে চার সারির ভূত দাঁড়িয়ে আছে—এখন সেখানে মজা হচ্ছে যে আমি যখন পিছিয়ে এসেছি—দু-বার, দু-বারই তো পেছোতে হয়েছে আমাকে—দু-বারই ক্লোজ আপ থেকে আরম্ভ করতে হয়েছে আমাকে—দু-বারই পেছোতে হয়েছে। পেছোনোটা পরে যখন সুপার-ইম্পোজ করেছি, সেটা ঠিক অ্যাবসোলিউটলি কোয়েনসাইড না-করলে একটা বিশ্রী কনফিউশন হ'তো—একটা আগে পিছিয়ে যেতো, একটা পরে পেছোতো। এখন, সে-মিউজিকের মাত্রা গুনে-গুনে একটা বিশেষ জায়গায় এসে জুমটাকে পেঁছোতে হয়েছে।

প্র. হ্যাণ্ড-হেল্ড ক্যামেরা তো ?

স. হ্যাণ্ড-হেল্ড নয়। ক্যামেরা ক্রেনে ছিলো—তবে জুমটা তো হাতে অপারেট করে। জুম লেন্স-এর একটা রড থাকে। সেটা ঘোরাতে হয় আর কি। যা-ই হোক সেটা তো এভাবে হ'লো।

প্র. আর ভূতের রাজার যে-বর দেওয়ার সিকোয়েন্সটা ?

স. রাজার ব্যাপারটা অ্যাবসোলিউটলি স্ট্রেট—এক্সট্রীমলি সিম্পল ডিভাইস ইউজ করা হয়েছে—কিন্তু এতোরকম সিমপ্লিসিটি আছে যে সব মিলিয়ে মনে হচ্ছে যে একটা দারুণ কমপ্লেক্স।...এক হচ্ছে ভূতের রাজার মুখের ওপর চকমক করছে অদ্ভুত আলোর মতো—সেটা কিছুই নয়, সেটা চুমকি লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। লাগিয়ে একটা সফ্‌ট লাইট সামনে রাখা হয়েছিলো। মুখটা নাড়লে ওগুলো চকমক করে, এবং ক্যামেরার লেন্সের সামনে একটা গজ দেওয়া হয়েছিলো ডিফিউশন গোছের—যাতে চকমকিটা আরেকটু হাইটেন্‌ড হয়। তারপর দুটো দাঁত, দুটো শোলার টুকরো আর ভুরুটাকে একেবারে শাদা ক'রে দেওয়া হয়েছিলো। সর্বাঙ্গে কালো রঙ মাখানো হয়েছিলো। তার ওপর মোটা শাদা পৈতে। ব্রহ্মদৈত্য আর কি।

\+ \+ \+

প্র. আচ্ছা ঐ ট্রিক শটগুলির কথা...যে রকম হাতে তালি দেবার সঙ্গে-সঙ্গে ওরা চ'লে গেলো—চোঁ ক'রে একটা শব্দ হ'লো।

স. শব্দ…আমি বলছি—প্রিসাইসলি কী-কী এলিমেণ্ট ওতে গেছে। যেই তালি দিলো তখখুনি একটা শট—মোমেণ্টারি একটা শট মাটি থেকে তড়াক ক'রে আকাশের দিকে উড়ে যাচ্ছে। ছোট্টো একটা শট আছে। সেটা কিছুই নয়—একটা মাচা করা হয়েছিলো—ক্যামেরাটা মাচার তলায় ছিলো—ওরা ওপর থেকে নিচে লাফিয়ে পড়েছে।

প্র. সেটা রিভার্সে করা হয়েছে ?

স. হ্যাঁ। রিভার্স ক্যামেরায় তোলা হয়েছে। কাজেই দ্য বিগিনিং অব দ্য অ্যাসেণ্ট আপনি পাবেন—তারপর একটা অপটিক্যাল এফেক্ট আছে, যেটা কিছুই নয়—একটা ডার্ক স্টুডিও ফ্লোরের মধ্যে একটা লাইট রাখা হয়েছিলো। একদিকে জুমটা এগিয়ে নিয়ে গেছি, পিছিয়ে নিয়ে গেছি। ঐ স্ট্রিপ অফ ফিল্মটা জুড়ে দেওয়া আছে। ফলে একটা এফেক্ট হচ্ছে যে আমি কোথায় চ'লে গেলাম, আবার কোথায় নেবে গেলাম। কিছুই না—একটা হোয়াইট স্পট ছোট্টো হ'য়ে গেলো, তারপর বড়ো হ'য়ে গেলো। আর আওয়াজটা তো উড়ন তুবড়ি [থেকে] পাওয়া যায়—আজকাল যে রকেট 'উশ' ক'রে যায়—সেটা রেকর্ড ক'রে নিয়ে একবার সোজা লাগানো হয়েছে, একবার সাউণ্ডট্র্যাকে উল্টে লাগানো হয়েছে। আর…অবশ্য বরফ-টরফে কোনো ফাঁকি নেই। অ্যাকচুয়ালি ছ-ফুট ডীপ স্নো-তে গিয়ে তোলা হয়েছিলো।

প্র. কোথায় গিয়েছিলেন ?

স. কুফ্রি, সিমলায়, যেখানে স্কীইং করতে যায়। তা সেই সেখানে তাদের (গুপী আর বাঘাকে) [নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো] নাইলনের মোজা পরিয়ে, কিন্তু জামা ছিলো ঐ গ্রামের জামা—ভেতরে বোধহয় একটা গরম জামা প'রে নিয়েছিলো। এত্তো স্পোর্টিং ছেলে দুটো না। তার মধ্যে লুটোপাটি গড়াগড়ি কত কী!…তার পরেই ভুল ক'রে দ্বিতীয় জায়গায় যেটা যাচ্ছে, সেটা হচেছ একটা রন্। রন্ কাকে বলে জানেন তো ? সেই কচ্ছের রন্। জয়সলমির থেকেও পঁয়তাল্লিশ মাইল ইণ্টেরিয়রে একেবারে টোট্যালি ফ্ল্যাট ডেজার্ট—টোট্যালি ফ্ল্যাট মানে…স্যাণ্ডটা ব'সে গেছে। জমা স্যাণ্ড, ওগুলোকেই রন্ বলে। এখানে একটা প্রায় একশো আশি ডিগ্রি ব্যাপি মিরাজ ছিলো—মরীচিকা। আমি এ-রকম মরীচিকা জীবনে দেখিনি। ঠিক মনে হচ্ছিলো একটা, মানে, একটা লিমিটলেস ওশেন প'ড়ে আছে।…এবং ওখানে পালে-পালে হরিণ জল খেতে গিয়ে মরে। আমি তো প্রথমে দেখে অবাক হ'য়ে গেলাম—প্রথম যখন আগে একটা গাড়ি চ'লে গেলো, আমি দেখছি দূর থেকে ওরা ওই হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে রয়েছে—ইলিউশন হচ্ছে।

যতো কাছে যাচ্ছি, ততো দেখছি জলটা রিসীড ক'রে যাচ্ছে। তারপর গিয়ে দেখলাম, না, বালি। ফ্যানটাস্টিক। সেখানে ঐ সেকেণ্ড ডিসেপ্টটা—ভুলটা…ষুণ্ডির যেটা হ'লো। কাজেই দুটি ক'রে শটের জন্য আমাকে একবার সিমলাতে যেতে হয়েছে—জাস্ট ফর টু শট্স দেয়ার।…

প্র॰ ক্যামেল প্লেটুন-এর কথা কিছু বলুন।

স. ক্যামেল প্লেটুন—তিনদিনের জন্য তিনশো ক্যামেল আমরা অ্যাফোর্ড করতে পেরেছিলাম। এবং তার মধ্যে আমাদের কাজ হ'তো। ক্যামেলের দল আসতো, দূর থেকে আসতো। দশটা নাগাদ এসে পেঁছাতো। ঐ রোদে তো কাজ করা যায় না গরমে—টপ সান যাকে বলে, ভীষণ খারাপ। দুটোর থেকে ওরা রেডি হ'তে আরম্ভ করতো, প্রত্যেকটি কস্টিউম—তিনশো লোকের অনেককে দাড়ি, সকলকেই পাগড়ি, জুতো এবং অস্ত্রশস্ত্র। এই সব ক'রে ওরা রেডি হ'তো অ্যাবাউট চারটে নাগাদ। চারটে থেকে সাড়ে ছ-টা পর্যন্ত আমরা তিনদিন শুটিং করেছি…ফর দ্যাট এণ্টায়ার ক্যামেল সিকোয়েন্স ইনক্লুডিং গুপীর ঐ গান। বুঝতে পারছেন—মানে, সে কী বলবো—এরকম স্পীডি শুটিং কেউ কোনোদিন করেছেন কিনা জানি না। তবে উই হ্যাড দি অ্যাডভানটেজ অফ থ্রী ক্যামেরাজ। অবশ্য থ্রী ক্যামেরাজও সবসময়ে চালাইনি—কেননা আমি তো শুধু একটাতেই থাকতে পারবো। আমি কোনোদিন ভরসা পাই না অন্যদের ক্যামেরায়, কী আসছে না আসছে আমি তো দেখতে পাচ্ছি না। সেজন্য মাত্র একটা সীনে একটা শটের জন্য তিনটে ক্যামেরা ব্যবহার করেছি। আদারওয়াইজ একটা ক্যামেরাতেই কাজ করেছি। এবং আমার যদি এক হাজার ক্যামেল [থাকতো] একা সাত দিন সময় পেতাম অনেক ভালো হ'তো ছবিটা। একটা রীয়েল, একটা ম্যাসিভ ফরওয়ার্ড মুভমেণ্ট—এটা ভীষণ মিস করি আমি নিজে ছবিতে।

প্র॰ ডেনসিটি যেটা তিনশো ক্যামেলে আসতে পারে, হাজার ক্যামেলে কি তার চেয়ে বেশি আসতে পারে ?

স. হ্যাঁ, ডাইমেনশনটা বেশি হ'লে ক্যামেরাটা আমি হাইটে তুলতে পারতাম। এখানে আমি সেটা অ্যাভয়েড করেছিলাম। কাছেই একটা উঁচু কনভিনিয়েণ্ট পাহাড় ছিলো। আমি ইচ্ছে করলে সেখানে ক্যামেরাটা রাখতে পারতাম, কিন্তু এ ভাস্ট ল্যাণ্ডস্কেপে তিনশো মানে কিছুই নয়। আমার মনে হয় হাজার ক্যামেল হ'লেও কিছু হ'তো না ; কিন্তু এর চেয়ে তবু বেশি হ'তো।…আমার যে এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে

তাতে আমার এখন মনে হয় দশ হাজার মতো লোক হ'লে বেশ একটা ভালো ম্যাস দেখানো যেতে পারে। তবে এখানে আমার একটা ডায়লোগ—সেটা আমি লাস্ট মোমেণ্টে কেন বাদ দিলাম জানি না। আমার ইচ্ছে ছিলো, মন্ত্রীকে যখন সেনাপতি এসে বলছে, 'সৈন্যরা কথা শুনলে না', তখন যদি ব'লে দিতো, 'আর কেউ আসেনি, মাত্র দুশো-তিনশো লোক। আর কেউ আসেইনি, তা যুদ্ধ করবে!' এটা ব'লে দিলেই হ'য়ে যেতো। ওটা ওরিজিন্যাল ডায়ালোগে ছিলো না। পরে আমি অ্যাড করেছিলাম, কিন্তু অ্যাট দি টাইম অব সুটিং সামহাউ—এ শুটিংটা কলকাতায় হয়েছে—তখন আর এ জিনিশটা মাথায় নেই, মনে ছিলো না।

\+ \+ \+

প্র. এই যে বলছিলেন যে তিনটে ক্যামেরা একসঙ্গে চালাতে পারতেন ইচ্ছে হ'লে—এক সঙ্গে চালানো মানে কী?

স. একসঙ্গে চালানো মানে একটাতে লং শট নিচ্ছি, একটাতে ক্লোজ আপ নিচ্ছি, একটাতে মিড শট নিচ্ছি।...'শুণ্ডি চলো' [ব'লে] আর্মি যেই মার্চ করতে আরম্ভ করলো—তখন ন্যাচারালি নর্মাল মেথড অব শুটিং ইজ আমি ক্যামেলের ডিটেল দেখাচ্ছি, লং শট থেকে দেখাচ্ছি, পায়ের তলা থেকে দেখাচ্ছি। তার মানে কী? একটা ক্যামেরা থাকলে বারবার তো সেটা করতে হবে। আবার পিছিয়ে আনতে হবে।...

\+ \+ \+

প্র. আচ্ছা একসময়ে, বছর পাঁচেক আগে—আমি অবশ্য ছবিটা দেখিওনি—কুরাসোওয়া একটা ছবি তুলেছিলেন যাতে একটা ট্রেন রবারির ব্যাপার ছিলো। সেখানে

স. হ্যাঁ, হাই অ্যাণ্ড লো। ট্রেন রবারি নয়, র‍্যানসম মনি দেবার ব্যাপার ছিলো।

প্র. 'ফিল্মস অ্যাণ্ড ফিল্মিং' সেই প্রসঙ্গে দিয়েছিলো যে সাতটা না ন-টা ক্যামেরা চালিয়েছিলো কুরাসোওয়া।

স. ন-টা। হ্যাঁ, কুরাসোওয়া তিনটে ক্যামেরার কম খুব কম ব্যবহার করেন।

প্র. আচ্ছা, এই সাতটা, ন-টা ব্যবহারের প্রয়োজনটা কী?

স. সাতটা, ন-টার বিশেষ কারণ ছিলো—পুরো র‍্যানসম মনিটা যখন দিচ্ছে —এরেঞ্জমেণ্টটা হয়েছে কী, পার্টিকুলার ব্রিজের ওপর দিয়ে যখন ট্রেনটা যাচ্ছে, তখন সেই পাশে নদীতে একটা জায়গায় সেই লোকটা দাঁড়িয়ে থাকবে, র‍্যানসম মনিটা মিফুনে ঠিক ঐখান দিয়ে পাস করার সময় জানলা দিয়ে পোর্টফোলিওটা ফেলে দেবে। এখন ওই ট্রেনটা—প্রত্যেকটা শটেই ব্রিজটা, নদীটা এস্টাবলিশ করতে হচ্ছে। অনেকগুলো শট আছে। তার মানে কী? তার মানে, আপনার কাছে একটা ক্যামেরা থাকলে, একবার ব্রিজ দিয়ে গেলো—বড়ো জোর দুটো শট নিতে পারছেন। আবার নেক্সট দিন আপনাকে ট্রেন জার্নি করতে হবে—আপনাকে ন-দিন [যেতে] হবে। সেটা একদিনে হবে। একটা ক্যামেরা হয় তো ড্রাইভারের সিটে ছিলো, আরেকটা ক্যামেরা ঘরটার মধ্যে ছিলো, আরেকটা ক্যামেরা বাইরে একটা বেসিন আছে, মুখ ধোবার ব্যাপার যেখানে, সেখানে ছিলো। একটা ক্যামেরা পয়েন্টিং টুওর্ডস দ্য রিভার, আরেকটা ক্যামেরা ঐ লোকটার কাছাকাছি ছিলো যাতে ট্রেনটাকে ব্রিজের উপর দিয়ে নিতে পারে। এ-রকমভাবে দে ক্যান অ্যাফোর্ড ইট। ওই যে ইচিকোওয়ার যে 'টোকিও ওলিম্পিয়াড' —আপনি দেখেছেন কিনা জানি না, [যাঁর তোলা] বারমিজ হার্প-টার্প—ইট ওয়াজ এডিটেড বাই ইচিকাওয়া, ইট ওয়াজ শট বাই হন্ড্রেড থার্টি-ফাইভ ক্যামেরামেন ইউজিং হন্ড্রেড থার্টি-ফাইভ অ্যারিফ্লেক্স (Arriflex)—তা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সারা ভারতবর্ষে সে-ক্যামেরা এখন ত্রিশটা আছে কিনা সন্দেহ। হয়তো কলকাতায় গোটা চারেক-পাঁচেক আছে। কাজেই ওদের রিসোরসেস আলাদা।

প্র. 'অভিযান' যখন আপনি তুলেছিলেন, তখন আপনাকে নিশ্চয়ই বেশি ক্যামেরায় কাজ করতে হয়েছে?

স. না, একটা—অল অ্যালং।...দুটো ক্যামেরা হ'লে খুব ভালো হয়। গাড়ির সঙ্গে ট্রেনের রেস হচ্ছে—একটা এটাতে, একটা ওটাতে—ব্যস হ'য়ে গেলো। ল্যাঠা চুকে গেলো। অনেক সময় বাঁচে।

খোশলা কমিটির রিপোর্ট

প্র. আচ্ছা, খোশলা কমিটির রিপোর্ট বেরোনোর পর চলচ্চিত্রে নগ্নতা ও চুম্বন-প্রদর্শনের বিষয়টি নিয়ে সারা দেশ জুড়ে সম্প্রতি যে-আন্দোলন চলেছে, সে-বিষয়ে আপনার মত কী?

স. এ-বিষয়ে তো একটাই অ্যাটিচ্যুড হ'তে পারে। ধরুন, কিসিং আমি ব্যবহার করেছি 'দেবী'তে। এখন যেখানে মনে হয়েছে কিসিংটাই স্বাভাবিক এবং কিসিং ছাড়া চলবে না, একটা বিশেষ দৃশ্যে যেখানে স্বামী অনেকদিন পরে ফিরে আসছে—শর্মিলা সেই মশারির নিচে ব'সে রয়েছে, সৌমিত্র এলো এবং সেখানে 'দে গো ইনটু এ ক্লিঞ্চ'। এবং সেটা যদিও আমি মশারির নেটের পিছন দিয়ে এবং একটু লঙ্গিশ শট-এ নিয়েছি, ইট ইজ অবভিয়াসলি এ কিস। তাছাড়া তারা করছেটা কী অতোক্ষণ ধ'রে? কাজেই ওয়ান ড্রজ এ কনক্লুশন—দ্যাট ইজ এ কিস—সো দেয়ার ওয়াজ এ কিস। ন্যুডিটি এখন অবশ্য সর্বত্র—সারা পৃথিবীতে চলছে, খুব বেশিও চলছে। কিন্তু আমাদের দেশের ব্যাপারে প্রথমত একটা জিনিশ আমার বলবার আছে যে আমার মনে হয়, এরোটিক সেক্শুয়্যাল ইনটেনসিটি বা প্রেম বা ভালোবাসা বা দাম্পত্য প্রেম—সবই ফিল্মে তো আজ ষাট বছর ধ'রে সাজেস্টেড হয়েছে, একেবারে ন্যুডিটি বা ঐ ধরনের বেডরুম দৃশ্য না-দেখিয়েও। বড়ো-বড়ো ফরাশি পরিচালকেরাও এটা করেছেন। তার মানে একটা ওবলিক ওয়ে আছে করবার, ডিরেক্টলি না-ক'রে। এখন আজকের দিনে একটা পারমিসিভনেস পশ্চিমে এসেছে ব'লে সেটার খুব সদ্ব্যবহার করছে পরিচালকেরা [তা নয়]। এখন আমাদের দেশে যখন চুম্বন জিনিশটাই এতোদিন হয়নি, যে-কারণে হোক—আগে, ইনসিডেন্ট্যালি, সায়লেন্ট ছবিতে হ'তো, আমি সেদিন একটা ছবি দেখলাম, ১৯২৭-এ তোলা। ছবিটার নাম 'দ্য থ্রো অব দ্য ডাইস'। এটা নিরঞ্জন পালের প্রোডাকশন, ইন কনজাংশন উইথ উফা। এতে অভিনয় করেছিলেন হিমাংশু রায়, মধু বোস, চারু রায়, নিউ থিয়েটার্সের আমলের ভানু ব্যানার্জি ও আরো সকলে। এবং তাতে তিন-চারটে জায়গায় দেখলাম চারুবাবু—তিনি এখনো বেঁচে আছেন—সীতা দেবীকে জড়িয়ে চুমু খাচ্ছেন। কাজেই ওটা হয়েছে, ব্যাপারটা। কিন্তু কী কারণে সঠিক জানি না—বোধহয় বৃটিশ সেন্সরশিপ, না কী জানি না—এটা আস্তে-আস্তে দেশ থেকে উঠে গিয়েছিলো। একটা মজার কথা বলি। আমি আমার এক মামার সঙ্গে 'কাল পরিণয়' নামে একটা বাংলা ছবি দেখতে গিয়েছিলাম। তখন আমার বয়েস দশ কি এগারো। সেটা ভীষণ অ্যাডল্ট ছবি আমার মনে আছে। তাতে বেডরুম সীন ছিলো, স্বামী-স্ত্রীতে পায়ে পা ঘষছে—এই শট।…আমার তো মনে হয় রাইট কনটেক্সটে একটা চুম্বন [তো বটেই], সবই চলতে পারে যদি ভ্যালিডলি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু চলতে পারে ব'লেই সেটা যে করা যাচ্ছে সেটাও না।

…ভারতবর্ষে কতোগুলি বিশেষ অবস্থার কথা আমাদের ভেবে দেখতে হবে—এখানকার দর্শকেরা কিসে-কিসে অভ্যস্ত—যে-ধরনের রিঅ্যাকশন [হয়তো] আপনি চাইলেন দর্শকের কাছ থেকে, সেটা নাও পেতে পারেন অনেক ক্ষেত্রে।

প্র. তাহলে ন্যুডিটি প্রসঙ্গে আমাদের প্রশ্নগুলি এভাবে বিন্যস্ত করতে পারি। এক, সত্যি ক'রে সিনেমার নিজস্ব শিল্পগত প্রয়োজনে নগ্নতা বা চুম্বনের প্রয়োজন আছে কি ? দুই, প্রয়োজন যদি থাকেও, তাহ'লেও দর্শকের কথা ভেবে কি তা প্রদর্শন করা চলবে ? তিন, চুম্বন বা নগ্ন দৃশ্য প্রদর্শনে আদৌ কী খারাপ হ'তে পারে ? দর্শককুল সহজভাবে কোনো-কোনো দৃশ্যকে যদি না নেয় তো তাতেই বা কী ? ইজ দেয়ার এনিথিং রঙ ইন বীয়িং মাইল্ডলি এরোটিক্যালি রাউজড ?

স. না। নাথিং ইজ রঙ। আমার যেটা মনে হয়—আমাদের দেশে যে-ধরনের কনভেনশনস বা অবস্থা—ধরুন, এটা তো [ভাবতে হবে] কে ছবি দেখছে, কী শ্রেণীর লোক ছবি দেখছে, কী ধরনের ইনডিভিজুয়্যাল কেসে নানা রকম রিঅ্যাকশন হ'তে পারে। কথার কথা বলছি—একজন হয়তো—ওয়ান ক্যান কাম ব্যাক হোম অ্যান্ড মাস্টারবেট। …এখন, সে একটা প্লেবয় ম্যাগাজিন দেখেও করতে পারে। এ-রকম, বা ওয়ান ক্যান গো টু দ্য ব্রথেল। যেখানে অবাধ মেলামেশা ছেলে-মেয়েদের মধ্যে নেই এবং নারীসঙ্গ পাওয়া যেখানে অপেক্ষাকৃত কঠিন ওদের দেশের চেয়ে, সেখানে…এ-রকম একটা ব্যাপার হ'তে পারে। এবং এতেও অলটিমেটলি কী ক্ষতি হচ্ছে আমি জানি না। সত্যি ক'রে কোনো ক্ষতি হয় ব'লে আমার মনে হয় না।

প্র. [তাছাড়া] ন্যুডিটি পারমিটেড হওয়া মানে এই নয় যে,…সেন্সরশিপ বিদায় নিচ্ছে। [এখন] সেন্সরশিপের চেহারাতে কোনো এক বিরাট মৌল পরিবর্তন ঘটেছে বা ঘটতে চলেছে ব'লে তো মনে হয় না। কাজেই খোশলা কমিটির সুপারিশের ফলে কী এমন বহুদূর বিস্তৃত পরিণাম দেবে, যার আশংকায় অনেকে উদ্বিগ্ন এবং যার আশায় অনেকে উৎফুল্ল ?

স. দেখুন এ-বিষয়ে…অনেকের সঙ্গে কথা বলেছি—মানে অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রীর সঙ্গে আমার তো মনে হয়—আমি যদি চাই—আমার কথা অবশ্য স্বতন্ত্র—কিন্তু অধিকাংশ পরিচালকের যেটা হবে—তাঁরা যদি চান একটা চুম্বনের দৃশ্য ছবিতে দেখাতে, অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রীর কাছ থেকে রেজিস্ট্যান্স আসতে পারে। একজন বললো, ওরে বাবা আমাদের অনেক ডোমেস্টিক রিপারকাশনস্ হ'তে পারে—বাড়িতে

এসে ধমক খাবো। বিবাহিত মেয়ে হ'লে তাঁর স্বামী করতে পারেন, বিবাহিত পুরুষ হ'লে তাঁর স্ত্রী করতে পারেন।…তাহ'লে ছবির কাস্টিংটা—ধরুন আপনার চিত্রনাট্য রয়েছে একটা চুম্বন বা বেডরুম সীন। সেখানে যাকে চাইছেন, তাকে পাবেন না। কেননা তার ঐ জিনিশটা করতে আপত্তি রয়েছে। এ-ব্যাপার তো আখছার হবে। আমি তো মনেই করতে পারছি না দু-একজন ছাড়া বাংলা দেশে কে এসব জিনিশে রাজি হবে।… [তাছাড়া, এটা খুব অর্থহীনভাবে] প্রমাণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে যে একমাত্র ঐ দুটো জিনিশেরই অভাব আছে আমাদের ছবিতে। আসলে অভাব তো অনেক কিছুরই।

প্র. তারা যেন ভাবছেন যে, ব্যস, এবারে গোদার বা ত্রুফোর মানের ছবি ডজনে-ডজনে উঠতে শুরু ক'রে দেবে।

স. এটা—এক কথায় একেবারে সিলি। এই নিয়ে লেখালেখি মাতামাতি [বড্ডো বেশি হয়েছে] ব'লে আমার মনে হয়। আমার নিজের একটা ধারণা এই যে সাহিত্য, নাটক, স্কল্‌পচার, পেইন্টিং, সিনেমাকে জড়িয়ে এক করা হচ্ছে, এটা বোধহয় ঠিক না। বা থিয়েটারকে। কেননা পেইন্টিং বা স্কল্‌পচারে ধরুন, পাথরে খোদাই করা ঐ ধরনের কী বলবো মিথুন দৃশ্য বা পেইন্টিং এ একটা এরোটিক মৌলিক মিনিয়েচার—ধরুন সেটা এক জিনিশ, [আর] স্টেজে লাইফ পারফরমার্স বা ফিল্মে অ্যাকচুয়্যাল জ্যান্ত মানুষেরা কিছু করছে, সেটার ইমপ্যাক্ট অনেক বেশি হচ্ছে।…পয়েন্ট এক হ'লেও একটাতে স্টাইলাইজেশন হচ্ছে। পেইন্টিং-এ বা স্কল্‌পচারে বা সাহিত্য যেখানে কোল্ড প্রিন্টে রয়েছে ব্যাপারটা, সেটার…রিঅ্যাকশনটা অনেক রিমুভ্‌ড।…যার জন্য আজ ষাট বছর ধ'রে বিদেশের শ্রেষ্ঠ পরিচালকেরা ওবলিক বা সাজেস্টিভ বা ইলিপটিক্যাল উপায় ভেবেছেন।

প্র. অর্থাৎ কিনা, ন্যুড এঁকেছেন, সাহিত্যে চুম্বন, আশ্লেষ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু চলচ্চিত্রে ন্যুড দেখাননি।

স. হ্যাঁ। ন্যুড দেখানো অবিশ্যি ফরাসি দেশে হয়েইছে—[তবে] এখন যেটা হচ্ছে, সেটা অনেক সময়েই—উইথ এ ফিউ এক্‌সেপশন্‌স, যেমন বের্গমান-এর দি সায়লেন্স। [এটা] দেখে আমার মন হয়েছে ঐ একমাত্র ছবি প্রায় একমাত্র ছবি যেখানে প্রত্যেকটা জিনিশই ভ্যালিড। ওছাড়া গল্পোটাই হয় না। কিন্তু আরো অন্য ছবি দেখেছি—সুইডিশ ছবি দেখেছি, সেদিনই তো একটা দেখলাম—কথা নেই, বার্তা নেই এক মহিলা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কাপড় ছাড়তে শুরু করলেন। এটা আমরা সকলেই জানি [যে] মেয়েমানুষে কাপড় ছাড়ে, সেটা এমন

একটা কিছু সিগ্‌নিফিক্যাণ্ট ডিটেল নয়, যাতে বেশি কিছু বলা হ'লো বা ছবিটা এগোলো। সেজন্য আমার মনে হয়েছে সেটা সেখানে ভ্যালিড না। আজকাল এই পরমিসিভনেসের সুযোগ নিয়ে অনেকে এটাকে বক্স অফিস [আবেদন] হিশেবে ব্যবহার করছেন।...আমি এটা একেবারে ফিল্মের দিক থেকে বিচার ক'রে বলছি। মর্যাল্‌স-এর কথা বলছি না।

প্র. আচ্ছা, শুনেছি আপনি নাকি কোথাও বলেছেন যে ভারতীয় সমাজ-জীবন ভিন্নধর্মী ব'লে এখানে চুম্বন বা নগ্ন দৃশ্য অপরিহার্য নয়।

স. না, এরকম কথা আমি কোথাও বলিনি। আমাকে অল ইণ্ডিয়া রেডিও থেকে একবারই প্রশ্ন করা হয়েছিলো। ওরা জিগগেশ করেছিলো, আপনার ছবিতে এসব ব্যবহার সম্বন্ধে কী মত? আমি বলেছিলাম, এ ব্যবহারের কথা এখন উঠছে না, আমি যদি করতে চাই, তাহ'লে করতে পারবো কিনা আমাকে আগে জানতে হবে। আমার মনে হয় অনেক দিক থেকেই বাধা আসবে।

প্র. এ-প্রসঙ্গে একটা কথা জিগগেশ করছি। সাম্প্রতিক সাহিত্যে বর্ণিত সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনে হয়তো খোলাখুলি শয়নকক্ষের ঘটনাক্রম বর্ণনার অবকাশ কম, যেমন ধরুন নরেন্দ্রনাথ মিত্রের বা তারাশংকরের লেখায়। কিন্তু কিছু-কিছু তো এমন কাহিনী লেখা হচ্ছে—যেমন ধরুন বুদ্ধদেব বসুর সাম্প্রতিককালের দুটি উপন্যাস, 'রাত ভ'রে বৃষ্টি' ও 'পাতাল থেকে আলাপ'—সেখানে নর-নারীর শারীরিক ঘনিষ্ঠতার কথা বলা হয়েছে অসংকোচে। অথচ কোনো যৌন সম্পর্কই অর্থহীনভাবে আমদানি করা হয়নি, একটা যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা সব সময়েই থেকে গেছে। বিশেষ ক'রে প্রথমটি—এটি কি আপনি পড়েছেন?

স. না।

প্র. (সংক্ষেপে কাহিনী বর্ণনা ক'রে) ধরুন, এই ধরনের একটা কাহিনী—এখানে নিশ্চয়ই সারটেন এরোটিক ইনটেনসিটি উইল নট বি আউট অব প্লেস।

স. না, না, মোটেই নয়।

প্র. ধরুন ঐ ধরনের কাহিনী নিয়ে যদি কোনো ছবি করতে চান, তাহ'লে নর-নারীর যৌন ঘনিষ্ঠতার কিছু চিত্র এসে পড়বে, তাই নয় কি?

স. হ্যাঁ, এসে পড়বে নিশ্চয়ই। কিন্তু এই যে 'রাত ভ'রে বৃষ্টি'র কাহিনীর বর্ণনা দিলেন—আমি তো সবই বুঝলাম, কী হয়েছে না হয়েছে—কিন্তু আপনি কোনো জায়গায় সরাসরি কোনো যৌন ডিটেল

সম্পর্কে বর্ণনা দিলেন না—সেটা আপনি একটা বলবার ঢঙ তৈরি ক'রে নিলেন—আমি কল্পনা ক'রে নিচ্ছি, যার চেয়ে অনেক বেশি বইয়ের মূল গল্পে রয়েছে। কাজেই, এখন এটা হ'তে পারে, কিন্তু এর ইন্‌টেনসিটিটা—সেটা ব'সে ভেবে দেখতে হয় যে এটা কতোটা ইমপ্লাই করা যায়, আর কতোটা দেখাতে হবে। এখন যদি কোনো ক্রুশিয়্যাল জিনিশ মনে হয় যে এটা পরিষ্কার খোলাখুলি না-দেখালে এই ভাবটা ফুটিয়ে তোলা যাবে না, সেখানে পরিষ্কার দেখানো উচিত ব'লে আমার মনে হয়। বুঝতে পারছেন ? এবং কতোটা ইমপ্লাই করা যায় ? কেননা ফিল্মে সবসময় সাউণ্ড ট্র্যাক ব'লে একটা জিনিশও আছে—ছবি প্লাস সাউণ্ড ট্র্যাক তো ? এবং ধরুন, পোলানস্কি-র একটা ছবি আছে, 'রিপালশন'। সেই ছবিতে দুটি মেয়ে, মানে দুই বোন—একটি অবিবাহিতা, আরেকটি বিবাহিতা, তার স্বামী আছে। অবিবাহিতা মেয়েটি পাশের ঘরে ব'সে থাকে এবং বোন ও তার স্বামী—পাশের ঘরে তাদের ইণ্টারকোর্স হচ্ছে, তাদের অর্গ্যাজম হচ্ছে, সবই হচ্ছে। সেটা কিন্তু কোনোটা দেখানো হয়নি, কিন্তু সেটা পরিষ্কার হ'য়ে গেছে সাউণ্ডের দ্বারা। ভীষণ, সাংঘাতিক ইনটেন্সভাবে সেটা ফুটে উঠেছে। কাজেই সেখানে [প্রশ্ন] ইমেজ, সাউণ্ড এবং কী পরিমাণে কী জিনিশটা ব্যবহার করা যায়, কতোটা ডিরেক্ট, কতোটা ইনডিরেক্ট, করলে এই পুরো জিনিশটাকে [প্রকাশ] করা যায়, পুরো এফেক্টটা আনা যায়, কোনো কম্প্রোমাইজ না ক'রে।···আমার মনে হয়, সাহিত্যে বলা আর ক্যামেরায় বলায় [তফাৎ আছে]। [ব্যাপারটা] অনেক ম্যাগ্নিফাইড হ'য়ে যায় ক্যামেরায়।···আমরা একটা ভালো লেখা ভালো সাহিত্য পড়লে বুঝতে পারি এটা পর্নোগ্রাফি নয়—অনেক উঁচু [দরের], সাহিত্যে যেখানে এরোটিক বর্ণনা আছে, সেখানে বোঝা যায় এটা পর্নোগ্রাফি নয়। সেরকম ইকুইভ্যালেণ্ট ক্যামেরা স্টাইল থাকা উচিত—যেখানে দুটোকে তফাৎ করা যায়।

প্র. আচ্ছা, একটা প্রশ্ন স্বভাবতই ওঠে, আমাদের দেশে না হয় বুঝি ছেলেমেয়েদের মেলামেশার ক্ষেত্র অবাধ নয় ব'লেই নর-নারীর দৈহিক প্রণয়দৃশ্যের প্রতি একটা দুর্নিবার আকর্ষণ রয়েছে, কিন্তু যে-দেশে নারীসঙ্গ অনেক অনায়াসলভ্য, সেই সব পশ্চিমী দেশের বক্স অফিসে ছবিগুলির এতো জনপ্রিয়তা কেন ?

স. ওটাতে একটা ভোয়াইঅরিজমের ব্যাপার রয়েছে। ছেলেমেয়েদের যেখানে অবাধ মেলামেশা রয়েছে, সেখানে যদি কেউ পাশের বাড়ির জানালা দিয়ে দেখতে পায় আরেকজন পুরুষ-মহিলার সংগম হচ্ছে,

তাহ'লে কি সে দেখবে না? যেহেতু সে বিকেলবেলা প্রেম ক'রে এসেছে? সেও দেখবে—এখানে একটা ভোয়াইঅরিজমের এলিমেণ্ট রয়েছে সিনেমায়। আমরা একটা কমিউনিটি ভাবে দু-হাজার লোক একসঙ্গে ব'সে একটা জিনিশ দেখছি—এর মধ্যে একটা পিকিউলিয়র ব্যাপার আছে। শুধু আমি দেখছি না, আমার সঙ্গে-সঙ্গে [অনেকে] দেখছে—এই যে একটা কারেণ্ট প্রবাহিত হচ্ছে এ প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে, এর একটা মজা আছে, থ্রিল আছে—দেখি, পাশের লোকটা কী করে দেখি—এ-জিনিশটা—একা ব'সে দেখলে এ-জিনিশটা হ'তো না।··· সিনেমার একটা পিকিউলিয়র কোয়ালিটি আছে, যেটা অন্য কোনো শিল্পে নেই—যেটা একান্তভাবেই বই পড়া, ছবি দেখা, এমন কি স্কাল্পচার দেখা বলুন, সেটা ভীষণ একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার—র্যাপোর্ট'টা এস্টাবলিশ্‌ড হচ্ছে, ওয়ার্ক অব আর্ট আর আমার মাঝখানে কেউ নেই, পাশে কেউ নেই।

সাহিত্যে অশ্লীলতা

প্র. আচ্ছা, চলচ্চিত্রে চুম্বন ও নগ্নতা প্রসঙ্গে জিগগেশ করছি, সাহিত্যে অশ্লীলতা, মানে এখানে আইনের সদাজাগ্রত প্রহরা বিষয়ে আপনার কী মত?

স. এ-বিষয়ে—এই নিয়ে মাথা ঘামায় কেউ আমি জানতাম না। [সেন্সরশিপ সাহিত্যে] থাকা উচিত নয়—বড়ো জোর বলা যেতে পারে, ভালো লাগলো না। সেন্সরশিপ আবার কী?···তাহ'লে তো আমার মনে হয় পনেরো আনা বোম্বাইয়ের ছবি বন্ধ ক'রে দেওয়া উচিত। ভলগারিটির কথা যদি বলেন—এখানে ভলগারিটির প্রশ্ন আসছে—সেটা অনেকে পছন্দ না-করতে পারে। বন্ধই যদি করতে পারে, যে-স্ট্যাণ্ডার্ড, যেদিক দিয়ে বিচার ক'রে একটা বই—ধরুন সমরেশের কোনো একটা বই, 'প্রজাপতি', সেটাকে ব্যান করার প্রশ্ন উঠেছে, তার চেয়ে আমার মনে হয় অধিকাংশ বোম্বাইয়ের ফিল্মের নাচ অনেক বেশি ভালগার।

প্র. আপনি সমরেশের 'প্রজাপতি' পড়েছেন?

স. 'প্রজাপতি'টা পড়িনি—'বিবর' পড়েছি। যেটা নিয়ে [বাদানুবাদ] আরম্ভ হলো। [অশ্লীলতার ব্যাপার নিয়ে] আমরা চিন্তাই করি না।

প্র. মুশকিলটা হচ্ছে যে আপনার পেশা মূলত লেখা নয়, ছবি তোলা।

যদি শুধু লেখা নিয়েই আপনি থাকতেন, তাহ'লে আপনি কি মনে করতেন না যে এখন যা সিচুয়েশন হয়েছে, তাতে কিছু লিখতে গেলে অনেক ভেবে-চিন্তে লেখককে লিখতে হবে এবং সে-অর্থে তার স্বাধীনতা নিদারুণভাবে শৃঙ্খলিত, কারণ যে-কোনো লোক একটা দশ টাকা দিয়ে দরখাস্ত দিলেই অশ্লীলতার [দায়ে লেখককে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারে]। আপনি জানেন বুদ্ধদেব বসুর 'রাত ভ'রে বৃষ্টি'-র বিচার চলছে। সমরেশ বসুর 'প্রজাপতি'র বিচারেরও পুরোপুরি নিষ্পত্তি হয়নি। এই নিয়ে এতো বেশি রাম্পস হয়েছে—তার ফলে যে-কোনো লেখকের পক্ষে সীরিয়াসলি কিছু লিখতে গিয়ে নার্সারি টেল ছাড়া আর কিছু লেখার কথা ভাবা যাচ্ছে না।

স. হুঁ, আমি বুঝতে পারছি—সে তো বটেই—খুবই আপত্তিকর। তবে ফিল্মের ব্যাপারে যেমন, 'আই অ্যাম কিউরিয়াস ইয়েলো', আপনি দেখেছেন? ওটা যে-রকম—সবচেয়ে বেশি—খোলাখুলি দেখানো হয়েছে। আমি চিত্রনাট্যটা পড়লাম। আমার কাছে রয়েছে এবং বহু ছবি আছে তাতে এবং স্বভাবতই বাছাই করা ছবি আছে আর কী, কাজেই মোটামুটি ব্যাপারটা কী বোঝা যায়। এটা ছেপেছে বোধহয় গ্রোভ প্রেস, আমেরিকাতে বেরিয়েছে। এখন, সেখানে সবই ঠিক আছে, কিন্তু যদি ট্রুথের প্রশ্নই ওঠে, সেখানে ডিরেক্টর—এটা নিয়েও মামলা-টামলা হয়েছিলো বোধ হয়, জজ সাহেব কী রায়-টায় দিয়েছিলেন, সে ভয়ানক তর্কাতর্কি, কোর্টে নানারকম চিৎকার-চেঁচামেচি হয়—তাতে ডিরেক্টর বললেন, কিন্তু তুমি একটা জিনিশ লক্ষ করো। তুমি এটাকে অবজেকশনেবল বলছো, তুমি কোনো জায়গা দেখাতে পারবে না যে একটা—কী বলে পেনিস ইজ অলওয়েজ লিম্প—কাজেই তুমি কেন ওটাকে ইন্টারকোর্স বলছো? ও-অবস্থায় কি ইন্টারকোর্স সম্ভব হয়? [হাস্য] সেখানে আরেকটা প্রশ্ন আছে যে, সেটাই কি তাহ'লে স্টাইলাইজেশন—ফিল্মের? (হাস্য) আমি জানি না—এই জন্যই ইউ ক্যান ওনলি গো আপ টু এ পয়েন্ট। সেইজন্য অলটিমেটলি আমার মনে হয় যে

প্র. তার মানে, [আপনি] বলছেন যে, ইউ ক্যান গো ওনলি আপ টু এ পয়েন্ট ফ্রম দ্য আর্টিস্টিক পয়েন্ট অব ভিউ, নট ফ্রম দ্য পয়েন্ট অব ভিউ অব সোশ্যাল ডেকোরাম অর সোশ্যাল মর্যালিটি?

স. না, না, ওসব প্রশ্নই আমি তুলছি না, ঐ সব কথাগুলোতেই আমি বিশ্বাস করি না। কেননা আমার মনে হয় না, এই সব এরোটিক বই বা ছবি—যাই বলুন না কেন, তাতে কোনোদিন কোনো সে-রকম ক্ষতি

হয়—তার চেয়ে অনেক বেশি অ্যাণ্টিসোশ্যাল কাজ, অনেক ব্যাপারে করা হ'য়ে থাকে। তাতে অনেক বেশি ক্ষতি হয়। ভায়োলেন্স-টায়োলেন্স ইত্যাদি দেখালে ব্যাংক রবারি ডিটেল্‌স-এ দেখালে—তার থেকে অনেক বেশি ক্ষতি হয়। [তাছাড়া] সিনেমা তো ষাট বছরের ব্যাপার, তার আগে কি কোনো দুশ্চরিত্র লোক ছিলো না গত দশ হাজার বছরের ইতিহাসে? তারা কোত্থেকে—কী থেকে তারা হ'তো?

অরণ্যের দিনরাত্রি

প্র. আচ্ছা, আপনার সাম্প্রতিকতম ছবি নিয়ে কিছু প্রশ্ন করি—আপনি সুনীলের গল্প নির্বাচন করলেন কী ভাবে?

স. প্রথমে 'অশনি সংকেত' করার কথা ছিলো। তারপর তো হ'লো না। তখন 'দেশ' পত্রিকায় একটা বিজ্ঞাপন দেখলাম—ব্লার্ব দেখে আমার ইণ্টারেস্টিং মনে হ'লো—একটা বনে চার বন্ধু যাচ্ছে এবং সেখানে কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হচ্ছে। অল্প ক-দিনের ঘটনা। এতে একটা কৌতূহল হয়—মনে হয় সিনেমাটিক যেন একটা—এখানে স্ত্রীলোক যায়নি ব'লেই আমার কাছে ইণ্টারেস্টিং…তারা স্ত্রীলোকের সঙ্গ পাবে ব'লে সেখানে যায়নি। তারা সেখানে একটু-একটু বোহেমিয়ানিজম করতে গিয়েছিলো। তা যাই হোক, বইটা পড়লাম। …ছবিটা আরম্ভ হয় কবে? মার্চ মাসে বোধহয়। আমি বইটা জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি নাগাদ পড়ি গত বছরে। দ্বিতীয়বার পড়ি দিন তিনেকের মধ্যে। তারপর, তার দিন তিনেকের মধ্যে চিত্রনাট্য লিখতে আরম্ভ করি। তারপর, দশ-বারো দিনের মধ্যে—যা আমার ইউজুয়্যাল টাইম লাগে, পনেরো দিনের মধ্যে আমার চিত্রনাট্য তৈরি হ'য়ে গিয়েছিলো।

প্র. আমরা আপনার এই চিত্রটির জন্য খুব ব্যগ্র হ'য়ে আছি। সেটা হচ্ছে যে এটা (অরণ্যের দিনরাত্রি), সাম্প্রতিক কালের বাংলা দেশের কয়েকটি টাইপ নিয়ে আপনি ছবি তুলেছেন। শুধু তাই নয় 'মহানগরে'র চরিত্র আর এখানকার চরিত্রগুলির মধ্যে শতযোজন তফাৎ।

স. আকাশ-পাতাল তফাৎ।

প্র. তারা প্রথানুগ—প্রথামতো চলে। কর্তব্যপরায়ণ পুত্র, কর্তব্যনিষ্ঠ মাতা-পিতা—একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার তাদের সমস্ত মূল্যবোধ

আঁকড়ে ধরে প্রাণপণ টি'কে থাকার জন্য লড়াই করছে। কিন্তু কতকগুলি কারণে তাদের ঘেন্না ধ'রে গেছে শহুরে জীবনে—তারা কোনো একটা পরিবর্তন ঘটাতে চায়। তবে তারা বাইরের জগতে যৌন-জীবনের মাত্রাতিরেক বদল চাইছে না।

স. আবার প্রত্যেকেরই ঠিক সমান পরিমাণে ঘেন্না ধরেছে তা-ও হয়তো নয়।...চারটে চরিত্র আমার যেমন দাঁড়িয়েছে— বইয়ের সঙ্গে যে মিল নেই তা নয়, মিল আছে। কিন্তু এটাতে আরো ডিস্টিংকটলি ইনডিভিজুয়্যালাইজড—যেমন সৌমিত্র, একজন ইয়াং প্রমিসিং একজিকুটিভ। তার ভবিষ্যৎ ভালো, সে উঠছে। শুভেন্দু কিন্তু অনেক বেশি টিমিড, বলতে পারেন ইনহিবিটেড। বসু-এর মেয়ের দিক চোখ আছে, কিন্তু এগোবার সাহসটা নেই আর কী। [সিনেমাতে] আমি সৌমিত্র আর কাবেরীর মধ্যে কোনো বন্ধুত্ব রাখিনি। এখানে আমি করেছি একেবারে স্ট্রেঞ্জার। কেননা আমার মনে হয়েছিলো, ওখানে গিয়ে হঠাৎ একটা চেনা মেয়ে বেরিয়ে যাবে এটা করলে জিনিশটা বড্ডো সহজ হ'য়ে যাবে। [তাছাড়া] ওরিজিন্যাল গল্পে আছে কাবেরী শর্মিলার দিদি, আমি বৌদিদি করেছি খুব ইম্পর্ট্যান্ট ডিফারেন্স এবং আমার মনে হয় ভ্যালিড। [যা বলছিলাম] অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য কোয়িনসিডেন্স, দেখা যাক না—যদি একেবারে না চেনে তাহ'লে আলাপটা কী ক'রে হয়। এটা একটা চ্যালেঞ্জ। সেজন্য আরো ইন্টারেস্টিং হয়েছে ওদের মীটিংটা। আরেকটি চরিত্র হরি, বইতে যে রবি—স্পোর্টসম্যান, যে জিল্টেড হয়েছে আরেকটি মেয়ের দ্বারা। ও এখানে কতকটা ঘা যাতে শুকোয়—এজন্য আসছে। ওর ভালো লাগে না কিছু আর। আরেকটি চরিত্র আমি রেখেছি শেখর। ওরিজিন্যালে যে শেখর, এ সে নয়। এর কোনো প্রব্লেম্ নেই, কোনো ফ্রাস্ট্রেশন নেই—কেননা এ একটা টিপিক্যাল প্যারাসাইটিক চরিত্র। রবি ঘোষ যেটা করেছেন। ওকে নিয়েছি কেননা ও থাকলে জমে। আর কোনো কারণ নেই নেবার।

প্র. আপনার এই ছবিটি তুলতে গিয়ে—এই কাহিনীতে যে এরটিক এলিমেন্ট আছে, সেই সমস্ত দৃশ্যে বা সেই দৃশ্যে শুধু নয়—ওয়ান্স দ্যাট মুড ক্যাচেস অন, তারপর থেকে যেসব শুটিং করলেন, সেখানে হাউ ডিড ইউ ফীল ?

স. ও নিয়ে দ্বিতীয়বার কোনো রকম চিন্তাই করিনি। আমি যা করবার ক'রে গেছি। কেননা আমার কাছে মনে হয়েছিলো—তবে হ্যাঁ, সত্যি কথা বলতে কী এখন যেভাবে পশ্চিমে দেখানো হয়, সেভাবে তো আমার দেখানো সম্ভব নয়।

প্র. সম্ভব নয় কেন বলছেন ?

স. ন্যুডিটির কথা যদি আসে, ধরুন সংগম—একটা সাঁওতাল মেয়েকে ধ'রে, সেখানে একটা সীন আছে—সেখানে দে গো টু বেড টুগেদার—বেড মানে মাঠে-ঘাটে শুয়ে। এখন সেই স্লীপ টুগেদার পুরো হাণ্ড্রেড পার্সেন্ট ইমপ্লাই করা আছে, এবং বেয়ার বডি-টডি সবই আছে। তবে এমনভাবে, যতোটুকু করা আছে তাতে পুরো সাজেশনটা আছে। কিন্তু কোনো জায়গায় আপনি এমন কিছু দেখতে পাচ্ছেন না, যেখানে কাঁচি লাগে।

+ + +

প্র. আপনি কতো হাজার ফুট শুটিং করেছিলেন এবারে ?

স. আমার এবারেও ফোর টু ওয়ান রেশিও-তে কাজ হয়েছে। ধরুন চল্লিশ হাজার ফুট শুট করেছি।

প্র. গোড়ার দিকের ছবিগুলো বাদ দিলে মোটামুটিভাবে এই রেশিওটাই আপনার থেকে আসছে ?

স. হ্যাঁ, এক 'পথের পাঁচালী' ছাড়া। অ্যাণ্ড আপ টু এ পয়েণ্ট 'অপরাজিত'।

প্র. 'পথের পাঁচালী'তে শুনেছিলাম প্রায় এক লক্ষ ফীট শুট করেছিলেন—কথাটা সত্যি ?

স. না, সত্তর-পঁচাত্তর হাজার ফীটের মতো। এ [অরণ্যের দিন রাত্রি] ছবিটা খুব ইকনমিক্যালি শুটিং হয়েছে এবং এডিটিঙে প্রায় কিছু বাদ যায়নি। শুটিং হয়েছিলো ৪২-৪৩ দিন। কিছু শুটিং আবার রিটেক করতে হয়েছে। কেননা আমরা একটা নতুন লেবরেটরি ব্যবহার করেছিলাম, তারা গোলমাল ক'রে ফেলেছিলো।

প্র. ['অরণ্যের দিনরাত্রি'র] শুটিং কোথায় হয়েছিলো—ধলভুমগড়ে ?

স. ধলভুমগড় জায়গাটা [আমি] পালামৌ ক'রে নিয়েছি। [কারণ] ক্যামেরার দিক দিয়ে আমার ধলভুমগড়টা একেবারে অনইণ্টারেস্টিং মনে মনে হয়েছে—এবং ওখানকার বনটা হচ্ছে একেবারে সেই খাড়া—সোজা-সোজা-সোজা শালবন, মনে হয় মানুষ একেবারে লাইন ক'রে পুঁতে দিয়েছে। তার মধ্যে কোনো মজা নেই—ক্যামেরার দিক দিয়ে কিছু নেই।

প্র. পালামৌতে বুঝি অনেক ঘন জঙ্গল ? মহুয়া প্রচুর আছে ? মহুয়ার কথা বলছি কেননা মহুয়া খুব পত্রবহুল তো।

স. ও—সবরকম আছে—সবরকম। তবে আমরা যে-টাইমে শ্যুটিং করেছি সে-সময়ে (মার্চ মাস) সমস্ত গাছ একেবারে বেয়ার। কিন্তু তখনও তো বর্ষাকাল আসেনি। অদ্ভুত মজা আছে তার মধ্যে। এবং আমি সঞ্জীব চাটুজ্যে এনে দিয়েছি একেবারে। ···আমরা ছেলেবেলায় সবাই 'পালামৌ' পড়েছি—নামটা আমাদের মনের মধ্যে গেঁথে রয়েছে এবং ওরা যদি কোথাও যেতে চায় প্ল্যান-ট্যান না-ক'রে, তাহ'লে পালামৌটা মনে পড়া অস্বাভাবিক নয়। কারণ যদি জঙ্গলে যেতে চায়, ওর মতো বিখ্যাত জঙ্গলের বর্ণনা তো হয় না। এমন কি তারা এক্সপেক্ট করছে যে হয়তো সঞ্জীব চাটুজ্যের বাংলোও এখনো রয়েছে—সেই রকম একটা ব্যাপার আর কী।

চলচ্চিত্র উৎসব

প্র. আচ্ছা, কাগজে দেখলাম দিল্লির এবারকার ফেস্টিভ্যালে আপনার কোনে ছবি দেখানো হয়নি? ও'রা কি চেয়েছিলেন?

স. হ্যাঁ, চেয়েছিলেন। কেননা ভারতীয় ছবি পাচ্ছিলো না ওরা। হিন্দি ছবি যেগুলো এন্টার করেছিলো, সেগুলো সবই রিজেক্টেড হ'য়ে গিয়েছিলো। তখন আমাকে ওরা ফ্র্যান্টিক্যালি টেলিগ্রাম করলো। আমি বললুম, আমি সাব-টাইটেল ছাড়া দেবো না। তখন মৃণালবাবু দিলেন। সুবিধে ছিলো ও'র—এবারের ভেনিস ফেস্টিভ্যাল নন-কম্পিটিটিভ ছিলো—কাজেই ও'র 'ভুবনসোম'।

প্র. আচ্ছা, আপনি কি 'অরণ্যের দিনরাত্রি' বিদেশের কোনো ফেস্টিভ্যালে পাঠাচ্ছেন?

স. কোন ফেস্টিভ্যালে পাঠাবো জানি না, কোনো একটা ফেস্টিভ্যালে পাঠাবো আর কী! তবে ফেস্টিভ্যাল টাইমে তো মনে হয় আমার আরেকটা ছবি তৈরি হ'য়ে যাবে—'প্রতিদ্বন্দ্বী'। সেটার কাজ মে বা জুন মাসের মধ্যেই তো শেষ হ'য়ে যাবে।

প্র. বহুদিন ধ'রেই লক্ষ করেছি, আপনি কান বা ভেনিসে কোনো ছবি পাঠাচ্ছেন না

স. কানের ব্যাপারে আমার একটা ইয়ে রয়েছে—গ্রাউজ আর কী। ঐ ওরা সেই 'চারুলতা' রিজেক্ট করার পর থেকে। ওটা এমন একটা ব্যাপার—

প্র. কী ভিত্তিতে রিজেক্ট করেছিলো? কারা সেই জুরিতে ছিলেন?

স. জাস্ট রিজেক্টেড—নট আপ টু দ্য মার্ক। ঐ—ওদের কী নাম, ভুলে গেলাম ফাভ্‌র ল্য ব্রে। তখন মানে, সে-বছর

প্র. আমি তো জানতাম গেলো ক-বছর কাইয়ে-শিবিরে একটা দৃষ্টিভঙ্গির বদল হয়েছে আপনার ছবির ব্যাপারে।

স. সে হয়েছে—পুরোপুরি। তা কাইয়ে-র সঙ্গে কান-এর কী সম্পর্ক? প্রি-সিলেকশনে ওদের সম্পর্ক নেই। না, প্রি-সিলেকশনের সময় ওদের নিজেদের সিলেকশন বোর্ড থাকে। আমেরিকান ছবিকে ওদের ভীষণ

প্র গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলছেন? সে তো বরাবরই দিতো। ওয়াইলার-এর 'ফ্রেন্ডলি পারসুয়েশন' ওখানে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পায়নি?

স. ওরা স্ট্রং ছবি দেখলে অনেক সময়ে রিজেক্ট করে। 'অপুর সংসার' রিজেক্ট করেছিলো ভেনিস। ওরা অবশ্য একটা গ্রাউন্ড দিয়েছিলো, বলেছিলো, দিস ইজ টু মাচ লাইক ইওর প্রিভিয়স টু ফিল্মস। ফর ইওর ওউন ওউন গুড আমরা বাদ দিচ্ছি।

শিল্প ও রাজনীতি

প্র. আচ্ছা, এবার প্রসঙ্গান্তরে যাই। আপনি কখনো সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করেছেন?

স. না, করিনি।

প্র. কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিলো?

স. না না! বলতে পারি আমার অধিকাংশ বন্ধু-বান্ধব বামপন্থী। এইটুকু বলা যায়।

প্র. এখন আবার তো বামপন্থীরও বামপন্থী বা তাদেরও বামপন্থী হয়েছে।

স. হ্যাঁ, কাজেই ও-নিয়ে আর ভাবি না। মানুষটাকেই দেখি, আর তার পন্থাটার নজর রাখি না।

প্র. আচ্ছা, শিল্পীর রাজনৈতিক চেতনা আদৌ থাকা দরকার কিনা বা থাকলে কতোটুকু থাকবে, আপনি মনে করেন? কোনোরকম রাজনৈতিক চেতনা না-থেকেও কি শিল্পী সার্থক শিল্পসৃষ্টি করতে পারেন?

স. রাজনৈতিক চেতনা বলতে তো রাজনীতি যারা করে তাদের ব্যর্থতার চেতনাও হ'তে পারে—যা ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এখন। রাজনীতি সম্বন্ধে একটা ডিসিলিউশনমেন্ট ছাড়া তো আর কিছু হ'তে পারে ব'লে আমার মনে হয় না। ইন জেনারেল, রাজনীতি বলতে আমরা যেটা বুঝি

এবং রাজনীতি যারা করছে সে-সব লোকের চেহারা আমরা প্রায়ই দেখি আর কী—আমার মনে হয় আশেপাশে কী ঘটছে সে-সম্বন্ধে ভীষণভাবে একটা সচেতন হওয়া দরকার।

প্র. কিন্তু বলবেন যে কোনো ইনভল্‌ভমেন্ট থাকলে শিল্পসৃষ্টির পথে একটা প্রতিবন্ধকতা এসে যাবে ?

স. অনেক ক্ষেত্রেই তো হয়েছে। যেরকম যেখানে শিল্পী তার থেকে—যেমন সোভিয়েট রাশিয়ার ছবি। এক যখন তারা প্রাচীন সাহিত্য নিয়ে ছবি করে সেটা আলাদা—কিন্তু আধুনিক যখনই করতে যায়, আধুনিক সমাজ বা লোকজন নিয়ে, তখন সেটা অত্যন্ত টু ডাইমেনশন্যাল, সিমপ্লিস্টিক ব্যাপার হ'য়ে যায়। মস্কো ফেস্টিভ্যালে [চুকরাইর সঙ্গে কথা হয়েছিলো। তিনি বলেছিলেন যে] তিনি সাত বছর ছবি করেননি আফটার 'ব্যালাড অব এ সোলজার'। ওঁর ৭২-৭৮ খানা স্ক্রিপ্ট ডিসঅ্যাপ্রুভ্‌ড হয়েছে ব'লে। স্টুডিও-তে কাজ দেখতে ব'সে থাকেন। ডনস্কয় [আমাকে জিগগেশ করেছিলো,] 'আমাদের ছবি কেমন দেখলে ? বলো না কেন—একেবারে রাবিশ'।

প্র. গত বিশ-তিরিশ বছর ধ'রে আমাদের দেশে রাজনৈতিক পরিস্থিতির রূপটা ধীরে-ধীরে পালটাচ্ছে। স্বাধীনতা লাভের আগে অনেক সোজা ছিলো—সবাই চাইতো স্বাধীন হ'তে।

স. হ্যাঁ, সেটা একটা চ্যানেলাইজ্‌ড হ'য়ে গিয়েছিলো তাদের আশাআকাঙ্ক্ষা

প্র. কিন্তু তার পরে অনেকগুলি আলোড়ন, বিশেষ ক'রে বাংলা দেশে তো হ'য়ে গেলো—যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক হামলা, দেশবিভাগ। তার ফলে একটা জটিল রাজনৈতিক চেতনা বাদ দেওয়া আমাদের অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয়নি। ফলে কোনো বিশেষ দলের সঙ্গে অন্তত একটা মানসিক রাপো তৈরি করা বা সেই দলের কোনো নেতাকে, আইডিয়েলাইজ করা বলবো না, ভালো মনে হওয়া—এগুলো বোধহয় ঘটতে বাধ্য।

স. হ্যাঁ, সেটা হয়েছে তখনকার দিনে। আমার মনে আছে যুদ্ধের সময়টা, যখন আমরা—তখন আমার অবিশ্যি ছাত্রজীবন বলা যায় না—তখন তো শান্তিনিকেতন ছেড়ে কলকাতায় এসে চাকরি করতে আরম্ভ করেছি আর কী। তখন একটা সোভিয়েট ছবি-টবি দেখার ভীষণ হুজুগ—দেখার উৎসাহ সাংঘাতিক। তার সঙ্গে অবশ্য ফিল্মের [উৎসাহের] ব্যাপারও জড়িয়ে রয়েছে। সব মিশিয়ে

প্র. আইজেনস্টাইন-পুডভকিনও আছেন, আবার শুধু চলচ্চিত্রকার আইজেনস্টাইন তো নন, কমিউনিস্ট দুনিয়ার পরিচালক আইজেনস্টাইন।

স. হ্যাঁ, ওটা বাদ করা যায় না—ওটা আলাদা ক'রে দেখা যায় না। কেননা, তখন যেহেতু আমার ফিল্মে ভীষণ উৎসাহ, তখন দুটোকে আলাদা ক'রে দেখতে পারছিলাম না আর কী।

প্র. পরে এই রাজনৈতিক চেতনার চেহারা কী-রকম হয়েছিলো? যখন ধরুন বাংলা দেশে—আমি পঞ্চাশের কথা বলছি—কাকদ্বীপ-তেলেঙ্গানা হচ্ছে বা হয়েছে—এ-রকম সময়ে আপনার আইডেনটিফিকেশন কিছুই হয়নি?

স. না, তখন আমি ভীষণভাবে বিশেষ—এমনি একটি চেতনা—মানে কী হচ্ছে না হচ্ছে জানা। কিন্তু সেই নিয়ে আমি খুব বেশি সময় দিইনি—আমার যতোদূর মনে পড়ছে। বা সেই নিয়ে আলোচনা করা, কেননা কতকগুলো আর্ট ফর্ম নিয়ে তখন এমনভাবে ডুবে গিয়েছিলাম, সেটা হচ্ছে প্রবেব্‌লি মাই মোস্ট—এক দিক দিয়ে, ভীষণ ক্রুশিয়্যাল পিরিয়ড। যখন সিনেমা, তার সঙ্গে-সঙ্গে আমার আবার আরো দুটো ইন্টারেস্ট—একটা সংগীত এবং আরেকটা আমার বিজ্ঞাপন জগতের একটা বইয়ের ব্যাপারে—টাইপোগ্রাফি, বুক-ডিজাইনিং নিয়ে এমনভাবে ইনভলভ্‌ড ছিলাম যে এ-ব্যাপারে—বরং তার চেয়ে বেশি ৪৩-৪৪-এ আরো বেশি ছিলো। কিন্তু সেই সময়টা ঐ দিক দিয়ে

প্র. অনেক ক'মে এসেছে?

স. ক'মে এসেছে ব'লে আমার যতো দূর স্মৃতিতে—যতো দূর মনে পড়ে আর কী! এখন তো রাজনীতি প্রায় আলোচনা বন্ধ ক'রে দিয়েছি—খবরের কাগজ পড়া অবধি। পলিটিশিয়ান্‌স অ্যান্ড হোল গেম অব পলিটিক্‌স খুব ডিজনেস্ট—খুব ছেলেমানুষি [মনে হয়]। বহুরূপীর মতো রঙ বদলাচ্ছে, প্রায় খেই হারিয়ে যেতে হয়। প্রলিফারেশন অব পলিটিক্‌স—বুঝতে ইচ্ছা করে না। তাছাড়া মাথায় সীমিত কম্পার্টমেন্ট। যা হচ্ছে তার জন্য আর কোনো খালি কম্পার্টমেন্ট নেই।

প্র. এখানকার ছাত্রবিক্ষোভ বিষয়ে কী মত?

স. এখানকার ছাত্রবিক্ষোভের বিশেষ কোনো চেহারা নেই—অনেকগুলি চেহারা মিশে আছে। ওদেশে অ্যান্টি-এস্টাবলিশমেন্ট—এখানে বিভিন্ন সমস্যাগুলি মিশ্রিত।...এখনকার জেনারেশন এতো ছাড়িয়ে চ'লে এসেছি—যে-আওতায় মানুষ হয়েছি—যে বোঝার অসুবিধা হয়।...ওরা যে-ধরনের কথা বলছে তা শিল্প-বিরোধী।

প্র. একটা জিনিশ লক্ষ করেছি যে, কলকাতায় বা দেশের জাতীয় জীবনে জীবনে যখনই কিছু আলোড়ন ঘটেছে তখনই, বা অন্তত অনেকবারই আপনি সংবাদপত্রের সম্পাদকের কাছে চিঠি লিখেছেন, বা নিজেকে

কিছুটা জড়িয়েছেন বা অ্যাসোসিয়েটেড হ'তে দিয়েছেন। আপনার এই রাজনৈতিক প্রতিবাদ ঘোষণার মধ্যে কোনো দলীয় রাজনীতি থাকার কথা ওঠেনি। তাই মনে হচ্ছিলো যে রাজনীতির সঙ্গে একেবারে সম্পৃক্ত ছিলেন না বলাটা কি ঠিক ?

স. না আপনি এটা কিন্তু আরো ইদানীং-এর ঘটনা বলছেন। আর্লি ফিফ্‌টিজ না, বরং সিক্সটিজ—সিক্সটিজের মাঝামাঝি সময়ের কথা। এটাও আমি বলবো, প্রথমেই আমি সেখানে ইনিশিয়েটিভ নিইনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে। আমি নিইনি, কিন্তু যে-মুহূর্তে আমার কাছে এসেছে, আমার মনে হয়েছে করা দরকার এবং তাতে কোনো ক্ষতি নেই, ভুল না জিনিশটা —এইভাবে আমি সইটা দিয়েছি।

প্র. এই মুহূর্তে এ-রকম কোনো ঘটনার কথা আপনার মনে পড়ছে, যেখানে আপনি শুনেই অংশ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ?

স. সেটা নানারকম ব্যাপারে হয়েছে। যে-রকম রবীন্দ্রসদন যখন তৈরি হ'লো, তার বাইরের বীভৎসতা দেখে—সেটা একটা কলঙ্ক—তখনো চিঠি লিখেছি, আবার ভিয়েতনামের দু-তিনটে ব্যাপারেও লেখা হয়েছিলো। আরো কী-কী ব্যাপার মনে পড়ছে না।

প্র. খাদ্য-আন্দোলনের ব্যাপারে বোধহয় আপনি লিখেছিলেন।

স. হ্যাঁ, ওখানে একবার গিয়েও ছিলাম।

প্র. ধর্মবীর রাষ্ট্রপতির শাসন যখন চালু করলেন, তখন তার প্রতিবাদে লেখা একটি চিঠিতে আপনার নামও ছিলো।

স. তা হবে।

প্র. আচ্ছা ধরুন, এই যে আইডেণ্টিফিকেশন উইথ এ কজ — এটা কি অন্যেরা পাঁচজনে বলছেন না গোড়ার ইনিশিয়েটিভটা আপনার ?

স. না, আমি তো সেটা বললাম—ইনিশিয়েটিভটা আমার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই না কিন্তু। চিঠি লিখে কোনোদিন বিশেষ কোনো কাজ হয়েছে ব'লে আমার মনে হয়নি। ওটা একটা জেসচর হিশেবে প্রায় বলতে গেলে। কাজেই ওটা—এই জিনিশটাই—করা দরকার, এটা আমার নিজে থেকে কখনো মনে হয়নি। তবে কেউ যদি লেখে, তাতে আমার সই দিতে কোনো আপত্তি নেই—এইরকম একটা অ্যাটিচ্যুড ছিলো আমার।

প্র. আমাদের দেশে, [রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও দেখেছি], দ্য এলিট অব দ্য নেশন হ্যাভ টু বি অ্যান্ড আর ইনভল্‌ভড ইন দ্য লাইফ অব দ্য কমিউনিটি অর দ্য নেশন। এই ইনভল্‌ভমেণ্ট কতোটা শিল্পীর

সামাজিক দায়িত্ব পালনের ইচ্ছাপ্রসূতে তা বলা কঠিন। পশ্চিমের শিল্পীরা, যে-কোনো কারণেই হোক, নিজেদের কাজের জগতের ভিতরে একান্তভাবে মগ্ন থাকেন। ধরুন, [আপনার পক্ষে] সোশ্যাল কমিটমেন্ট রাখতে গেলে, আপনার যা এবসোর্বিং কাজ, তাতে ক্ষতি হবার সম্ভাবনা।

স. এ-জিনিশগুলো আমি করি না। সেজন্য [আমার কাছে] যখন নামটা চাওয়া হয়, তখন বলি আমি কিন্তু কোনো ব্যাপারে যেতে পারবো না। আপনার শুধু নামটা পেলেই হবে? এখন আমি নাম দেওয়াটাও কমিয়ে দিয়েছি। এমনি একটা উদাহরণ দিচ্ছি। এই যে ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটি, তার প্রেসিডেণ্ট হওয়া—আমি ওদের অনেকদিন থেকেই বলছি এবং গোড়াতেও বলেছিলাম যে অন্য দেশের ফিল্ম সোসাইটির মধ্যে কিন্তু অ্যাক্টিভ ফিল্ম-মেকাররা অ্যাক্টিভলি জড়িত না; এটা যে দর্শক বা ফিল্ম-বোদ্ধা বা ফিল্ম নিয়ে যারা চর্চা করে তাদেরই অর্গ্যানাইজেশন। এখানে ডিরেক্টর—তার প্রেসিডেণ্ট হিশেবে নাম রইলো, চেক সই করলো, চিঠি সই করলো—এটা কিন্তু কোথাও নেই এবং এটা না করাই ভালো।

প্র. আচ্ছা, আজকের পরিবেশে, মানে, কী ধরনের রাজনৈতিক মতামত কোনো শিল্পীর পক্ষে রাখা সম্ভব? বা কোনো অ্যাফিলিয়েশন, মানে ইমোশনাল অ্যাফিলিয়েশন

স. শিল্পী হিশেবে আমি এটুকুই বলতে পারি, যে-পরিবেশে আমি, আই উইল বি ফ্রী টু ওয়ার্ক অ্যাজ আই লাইক—কম্প্লীটলি। এছাড়া আমার আর কোনো মতামত নেই। [এই কারণে] একনায়কত্বে আমার ভীষণ আপত্তি—যতো ফাশিস্ট ততো রেট্রোগেড।

প্র. একটা সাধারণ জনশ্রুতি কিন্তু, যে সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে বামের গভীর সম্পর্ক। সেটা 'পথের পাঁচালী' দরিদ্র গ্রামবাসীদের জীবনালেখ্য ব'লে, কি আপনার প্রথম ছবি ব'লে, জানি না।

স. সেখানে তো আবার 'জলসাঘর' সম্বন্ধে বলা হয় যে আমি ফিউড্যালিজমকে তুলে ধরেছি, তাকে কনডেম করিনি, আই হ্যাভ বিন সিম্প্যাথেটিক টু ইট, ইত্যাদি নানারকম মতামতই তো শোনা যায়। বলা হয়নি? আমি সত্যি ক'রে কনটেম্পোরারি সবজেক্ট নিয়ে কোনো ছবি করিনি, এই যে আজকের দুঃখ-দারিদ্র্য, আজকের স্ট্রাগল, সে-নিয়ে কোনো ছবি করা হয়নি—সেও তো অনবরত বলা হচ্ছে। কী-নিয়ে ছবি করা হবে—আমার অ্যাটিচ্যুড যাই থাক না কেন—আমি ছবি করার মতো বিষয়বস্তু পাবো, এমন তো কোনো কথা নেই এবং আই অ্যাম

নট ইনটারেস্টড বাই ওয়ান সিঙ্গল অ্যাসপেক্ট। আমার মনে হচ্ছে, যেহেতু আমাদের দেশের ইতিহাস এবং অনেক কিছু জরুরি জিনিশ ছবিতে আজ পর্যন্ত কেউ সে-রকমভাবে এক্সপ্লোর করেনি—আমার মনে হচ্ছে যে, হোয়াই নট ডু অ্যাজ মাচ অ্যাজ ইউ ক্যান, অ্যাজ মেনি ডিফারেণ্ট থীম্‌স অ্যাজ ইউ ক্যান? …নানারকম বাজনা বাজিয়ে দেখার বরাবরের ইচ্ছে আমার। [ধরুন] 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'। যদিও পিকনিক পার্টি হিশেবে তোলার ইচ্ছে ছিলো—গল্পটার মেজাজও ছিলো ল্যাকোনিক, স্যাটেরিকাল। আর বালি ব্রিজের পাশের পূর্ণেন্দু ঠাকুরের বাড়ি শুটিঙের জন্য ঠিকও করেছিলাম [এক সময়]। তারপর যখন বাড়ি না পাওয়ায় ভেনু বদলানো হ'লো তখন সম্পূর্ণ অন্য ধরনের ছবি হ'য়ে দাঁড়ালো 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'। দার্জিলিঙের ম্যালটাকে ভীষণ ইণ্টারেস্টিং লাগলো, কালারও মাথায় এসে গেলো। যে-সব লোক নেওয়া হচ্ছে তাদের চরিত্র প্রকাশিত হয় তাদের পোশাকে, সেজন্য কালার হ'লো। রঙের ক্লাস্টারকে একটা ডেফিনিশন দেওয়া যেতে পারে—দুই বোনের মধ্যে তফাৎ রাখার চেষ্টা। রঙ ডিসাইড করায়—বরফের পর রোদ-কুয়াশা পড়ন্ত রোদ—লোকেশন বাছা হ'লো ক্রোমাটিক নিয়মে। বিশ্বনাথন, অন্য চরিত্র বা, বার্ড ওয়াচার—সবার ব্যাক গ্রাউণ্ড অন্যভাবে বিন্যস্ত করা হ'লো। [রঙের দিক থেকে] ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইটে যেমন ভাবটা পাওয়া যায়, রঙে তেমন হয় না। তাছাড়া একটা প্রিটিফিকেশন আছে।…কথা না বললে 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র কিছুই হয় না—সাব-টাইটেল ছাড়া ছবিটি বোঝা সম্ভব নয়; যে-সম্বন্ধকে দেখানো হয়েছে—কথা তাদের বলতে হবেই…কোনো আবেগ, কোনো রিলেশনশিপকে বিশেষভাবে দেখানোর অবকাশ নেই।

ভারতীয় চলচ্চিত্র সমালোচনা

প্র. এদেশে আপনার ছবি নিয়ে অসংখ্য প্রকাশিত লেখার মধ্যে কিছু-কিছু ভালো লেখা পড়িনি তা নয়, যেমন জীন-হারম্যান-এর লেখা বিশেষ ক'রে, বা ভাওয়ানাগারের কথা বলতে পারি—বা চিদানন্দবাবুও কিছু-কিছু ইণ্টারেস্টিং লিখেছেন। কিন্তু মূল ব্যাপার হচ্ছে যে, আমাদের দেশের চিত্র-সমালোচনার প্রচলিত ধারা লক্ষ করলে দেখা যাবে যে সেসব চলচ্চিত্রবোধ থেকে লেখা সমালোচনা নয়।

স. না, একেবারেই নয়, সেটা একটা মূল কথা। দ্য ভেরি বেস্ট অব

রিভিউজ যা এখানে হয়েছে, তারা যেন ছবিটাকে প্রায় একটা সাহিত্যের— অনেক সময় যেগুলো সবচেয়ে ভালো বলা যেতে পারে সেগুলোর মধ্যেও ; সেটাকে সিনেমা হিশেবে দেখা হচ্ছে, একটা আলাদা, বিশেষ শিল্প মাধ্যম ব'লে দেখা হচ্ছে—সেটা আমি কোনোদিন বোধ করিনি। 'মিসাঁ-সেন' ব'লে যে জিনিশটা, সেটার ওপর আজ পর্যন্ত কেউ লিখলো না। আমার বহু ছবিতে নানারকম ইন্টারেস্টিং জিনিশ আছে, যেগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো যায় ও অ্যানালাইজ করা যায়—আজ পর্যন্ত কেউ করেনি। [অথচ] কোনো-কোনো অসুবিধে থাকলেও বোঝার ব্যাপারে পশ্চিমী সমালোচকদের পেনিট্রেশন অনেক বেশি—যা বলতে চাই তা হঠাৎ কেমন ক'রে [ওরা] বুঝে ফেলে। চিদানন্দ আমার সম্বন্ধে যে-লেখা লিখেছে তাতে কোন নায়কের সঙ্গে রাবীন্দ্রিক নায়ক ইত্যাদি, এবং তার সোশ্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড ইত্যাদি, এবং সত্যজিৎ রায় কেন এরকম হলেন, তাঁর মিড্‌ল ক্লাস, হেন-তেন—তাঁর ব্রাহ্ম আপব্রিঙ্গিং— পঁচিশ রকমের কথা আছে ; কিন্তু—যেমন ধরুন, 'গুপী গাইন'কে তো বলেছে খুব ইন্টারেস্টিং অপেরাটিক গল্প—খুব ভালো হয়েছে, কিন্তু এ-ছবিটির সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের অন্য কোনো ছবির মিল নেই, অতএব মনে হচ্ছে সত্যজিৎ রায়ের এটা পিওরলি একটা কম্যার্শিয়াল এন্টারপ্রাইজ হিশেবে করেছেন। আমি ধ'রে নিচ্ছি দ্যাট হি (চিদানন্দ) রেপ্রেজেন্টস ওয়ান অব দি বেস্ট ক্রিটিকস্ অব দি কান্ট্রি। সকলে বলেনও তাই। কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কোনো লেখা পড়িনি, বা কারোরই পড়িনি যেখানে—আমি যারা সচরাচর লেখে, তাদের কথা বলছি, একটা হঠাৎ আইসোলেটেড লেখা বেরিয়ে গেলো এখানে-ওখানে, সে-রকম লেখা বেরোচ্ছে কিন্তু। কিছু ফিল্ম সোসাইটির পত্রিকায় দু-একজন ছেলে আমি দেখতে পাচ্ছি—তারা ফিল্মটাকে বুঝতে শিখেছে, কিন্তু এমন কোনো লেখা আমি পড়িনি যেটা দেখে বোঝা যায় যে ফিল্মের কতকগুলো বিশেষ দিক আছে, সেগুলো তাদের মনে একটা রি-অ্যাকশনের সৃষ্টি করেছে যার থেকে তারা ঐ দিকগুলো বিচার করবে—'মিসাঁ-সেন' বন্ধন, একটা 'সিকোয়েন্স বন্ধন, কিংবা একটা স্পন্দন, একটা চিত্রনাট্যকে কী-ভাবে ভাগ করা হয়েছে, তার ছন্দ, তার ফর্ম—অর্থাৎ যেসব গুণের ফলে একটা ছবি সিনেমা হয়।

প্র. **যদি, আবার ওয়েল-নোন লিটারারি ওয়ার্কের ফিল্মাইজেশন হয়, তাহ'লে মূল কাহিনী থেকে ডিপারচারগুলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা—এই পরিবর্তনগুলো কেন করলেন ইত্যাদি। যেগুলি মিললো না, সেটা করবার যেন আপনার নৈতিক অধিকার ছিলো না।**

স. হ্যাঁ, সে তো আছেই।

প্র. ছবির মূল্য বিচারে মূল সাহিত্যকর্মের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা কতদূর যুক্তিযুক্ত ব'লে আপনি মনে করেন? অর্থাৎ মূল গল্প বা উপন্যাসের সঙ্গে চিত্রটির তুলনা বা প্রতিতুলনা চিত্র-সমালোচনার ক্ষেত্রে কতটা প্রাসঙ্গিক বা অর্থবহ?

স. কোনো উপন্যাসের চিত্ররূপ দেখতে গিয়ে সেটাকে প্রতি পদে মূল উপন্যাসের সঙ্গে মিলিয়ে না দেখাই ভালো। যেহেতু সাহিত্য ও সিনেমা দুটি আলাদা আর্টফর্ম, সেহেতু যে-কোনো কাহিনীর চিত্রনাট্য রচনা করতে গেলে সেটার অল্পবিস্তর রদবদল ক'রে যেতে হয়। এক আর্ট ফর্ম থেকে অন্য আর্ট ফর্মে নিয়ে যাওয়ার প্রশ্ন যেখানেই উঠছে, সেখানেই এটা করতে হয়। শেক্‌সপিয়ারের 'ওথেলো' অর 'ম্যাকবেথ' থেকে অথবা বোমার্শে-র 'ম্যারেজ অব ফিগারো' থেকে ভের্দি ও মোৎসার্ট অপেরা রচনা করেছেন। যাঁরা সংগীত বোঝেন না শুধু সাহিত্যই বোঝেন, তাঁরা মূল নাটকের সঙ্গে এইসব অপেরার মিল খুঁজতে গিয়ে হতাশ হবেন এবং বলবেন ভের্দি ও মোৎসার্ট সাহিত্যের অবমাননা করেছেন। সেইরকমই সাহিত্যাশ্রিত কোনো ছবি দেখতে গিয়ে অনেক লিটারারি পিউরিস্ট (যাঁরা চিত্ররসিক নন) মূলের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ না-দেখে ব'লে বসেন, সাহিত্যের অবমাননা হ'লো। অথচ এটা এঁদের বোঝা দরকার যে, কোনো কাহিনী যদি কোনো পরিচালককে কোনো দিক দিয়েই প্রেরণা জুগিয়ে না থাকে তাহ'লে সে-কাহিনী পরিচালক নির্বাচন করলেন কেন? মূল কাহিনীর যে-বিশেষ দিকগুলি পরিচালককে অনুপ্রাণিত করে, চলচ্চিত্রে তার প্রতিফলন অবশ্যই থাকে এবং সাহিত্যের প্রতি এই আনুগত্যটুকু সব পরিচালকই স্বীকার করেন। ছবি যদি আর্ট হিশেবে উতরোয়, তাহ'লে মূলের সঙ্গে মিল-বেমিলের প্রশ্নটা শিল্পের বিচারে অবান্তর। যেখানে ছবি শিল্প হিশেবে ব্যর্থ, সেখানে যদি মূলকাহিনী উঁচুদরের সাহিত্য হয়, তাহ'লে অবশ্যি আক্ষেপটা স্বাভাবিক এবং সেটা চিত্ররসিক ও সাহিত্যরসিক উভয়েই সমানভাবে বোধ করেন।

প্র. এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে 'অপুর সংসার' যখন তুললেন, তখন 'দেশ'-এ আপনার একটি চিত্রসমালোচনা পড়েছিলাম। তার পরে আপনি একটি চিঠি লিখেছিলেন। সমালোচক দেখিয়েছিলেন, আপনি মূল সাহিত্যকর্ম থেকে কোথায় স'রে গিয়েছিলেন। যেমন ধরুন, কেন সৌমিত্র অপর্ণার ভাইকে চড় মারলো?

স. হ্যাঁ, জানি আমি।

প্র. আপনি তার উত্তরে চিঠি লিখেছিলেন যে মূল ছবির সুরটা আপনি কতো অক্ষত রেখেছেন। ঐ সমালোচনায় যতোদূর মনে পড়ে এ-কথা বলা হয়েছিলো যে সত্যজিৎ রায়ের চোখে কিছুই এড়ায় না তা সত্যি নয়। ইস্টার্ন রেলওয়ে দ্যোতক ই. আর. অস্পষ্টভাবে লেখা ছিলো ই. বি. আর.-এর যুগে—সেটা এড়িয়ে গিয়েছিলো সত্যজিৎ রায়ের দৃষ্টি। আমাদের প্রশ্ন যেখানে এই লেভেলের কণ্ট্রোভার্স হয়, সেখানে আপনি কেন প্রবেশ করেন ?

স. আমার মনে হয় যে আমাদের ফিল্ম এডুকেশনটা এতো পিছিয়ে অন্তত তখনকার দিনে ছিলো এবং ঐ গোড়ার দিকে আমার কেরিয়ারের শুরুতে, এ-ধরনের একটা ভ্রান্ত ধারণা—কেননা 'দেশ' অনেকে বেদবাক্যের মতো পড়ে, পড়তো তখনকার দিনে। আমার মনে হয়েছিলো এই রকম একটা লেখা—এ তো সকলেই বিশ্বাস করবে এবং যে-ধরনের ইনফ্লুয়েন্স তাতে হবে, সেটা আমাদের পক্ষে ক্ষতিকর।

প্র. কমার্শিয়্যালি ?

স. কমার্শিয়্যালি বলুন—ইন জেনারেল একটা ব্যাপকভাবে ফিল্ম সম্বন্ধে স্পষ্ট পরিষ্কার সত্য ধারণা প্রচার করা, এটাও সঙ্গে-সঙ্গে দরকার। আমাদের দেশে ব'লে মনে হয়েছিলো—যেখানে আপনি সমালোচকের সাহায্য পাচ্ছেন না। ওখানে সিচুয়েশনটা কিন্তু আলাদা। ওখানে ভালো-ভালো ক্রিটিক রয়েছে যারা লিখবে।

প্র. হ্যাঁ, সেইটাই কথা। আপনি ধরুন রাইজ কি ক্লেটন কি রিচার্ডসন কি অ্যান্ডারসন—এঁদের কোনো ছবি যদি বহুল প্রচারিত কোনো পত্রিকায় সমালোচক অন্যায় নির্মম সমালোচনা করেনও, এঁরা—দে উইল সিম্পলি ইগনোর ইট।

স. ঠিক তাই। কিন্তু আমাদের এখানে একটা বিশেষ সিচুয়েশন রয়েছে—এখানে আর কেউ নেই আমাকে সাপোর্ট করবার। এমন কোনো রিভিউ হবে না, যেখানে জিনিশটার মূল বিচার হবে ঠিকভাবে—যথাযথভাবে। আমি এবারে 'দেশে' (বিনোদন সংখ্যা ১৩৭৫) যে-লেখাটা লিখেছি—আমি ইচ্ছে ক'রেই ওখানে লিখেছি, কেননা খুব বেশি লোকে পড়বে ব'লে—[তাতে] আমি একেবারে সমালোচকের ভূমিকা নিয়ে লিখেছি, আমার পরিচালকের ভূমিকা নিয়ে লিখিনি। আমার কোনো ছবির উল্লেখ এতে নেই। আমি যেন সমালোচকের [দৃষ্টিতে] অন্যের ছবি নিয়ে—অন্য মানে বিদেশের ছবি নিয়ে—এবং একেবারে গোড়া থেকে শুরু ক'রে আজ পর্যন্ত ভাষাটা কী-ভাবে মডিফায়ড হয়েছে আর ফিল্মের ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে কী বোঝায় সেটা লিখেছি। এটার দরকার

আছে। আমার মনে হয় যদি ফিল্ম এডুকেশনটা সঙ্গে-সঙ্গে করা যায়—এটা আমাদের লাইনে, আমাদের রাস্তায় যাঁরা চলতে চাইবেন [তাঁদের করা উচিত]—তাতে প্রত্যেকের সুবিধা হবে। তা না-হ'লে অনেক ভুল বোঝাবুঝি হবে। ভুল বোঝাতে আমার কোনো লাভ নেই—যদি ক্ষতি থাকে, ক্ষতি হ'তে পারে। কিন্তু লাভ মোটেই নেই।

সাহিত্যকর্ম

প্র. এবার আমাদের শেষ প্রসঙ্গে চ'লে আসি। সেটা হচ্ছে, চলচ্চিত্রকার ছাড়াও আপনার অন্যান্য ভূমিকা আছে। আপনি যদি ছবি না-ও করতেন, তাহ'লেও আপনি আলোচনার বিষয় হ'তে পারতেন। কৈশোরে যখন আপনার আঁকা 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার'-এর কভার দেখেছি বা তা নিয়ে আলোচনা করেছি, তখন আপনি ছবি তুলছেন ব'লে তো জানতাম না।

স. না, [তখন] বোধহয় ছবি তুলছিলামও না।

প্র. তা, জিজ্ঞেস করছি যে আপনার এই—এই চলচ্চিত্র পরিচালনার প্রায় সঙ্গে অন্য [অনেক] কিছু সমানে [আপনি] ক'রে যাচ্ছেন। কভার হয় তো করছেন না, কিন্তু লিখে চলেছেন। প্রবন্ধ লিখছেন সংগীত, শিল্প, চলচ্চিত্র সম্বন্ধে। তাছাড়া বিশেষ ক'রে ছোটোদের জন্য লিখছেন—'বাদশাহী আংটি' লিখেছেন।

স. কভার—'এক্ষণ'-এর কভারটা করি নিয়মিত, আর কিছু করি না।

প্র. এই তো গত বছর 'ফ্রন্টিয়ার'-এর পুজো সংখ্যায় আপনি লিমেরিক অনুবাদ করেছিলেন।

স. বোধহয় বাবার কবিতা অনুবাদ করছিলাম! সেগুলো করি মাঝে-মাঝে খানিকটা চাপে প'ড়ে। যেমন গল্প, ছড়া লেখা বা লিমেরিকের অনুবাদ তো 'সন্দেশ' আছে ব'লে—'সন্দেশ' না-এলে হয়তো আমার লেখা আরম্ভই হ'তো না। 'সন্দেশ'টা যেহেতু রিভাইভ করা হ'লো, সেই হেতু সেটাকে ফীড করার জন্যে—সেটাকে আনন্দের সঙ্গেই করা হয়েছে।

প্র. 'সন্দেশ'-এ তাহ'লে নিয়মিত সময় দেন কিছুটা?

স. হ্যাঁ, এটাতে দিতে হয়। 'সন্দেশ'-এর জন্য আমি নিয়মিত লিখি।

প্র. 'সন্দেশ' এর প্রকাশনটা দেখেন কে?

স. দেখেন নলিনী দাশ, আমার কাজিন, পুণ্যলতা চক্রবর্তী'র মেয়ে, জীবনানন্দর ভাই অশোকানন্দ দাশের স্ত্রী—ও'রাই দেখেন। লীলা মজুমদারও আছেন। উনি ম্যানাসক্রিপ্টগুলো দেখেন। আমি শুধু একটা ধাঁধা প্রতিযোগিতা—প্রত্যেকবারই— বছরে দু-বার ক'রে [দিই]; এক-একটা নতুন ধরনের প্রতিযোগিতা—সেটা খুব ইন্টারেস্টিং। এবং গপ্পো আর ছড়া।

প্র আচ্ছা এসব শুনলে মনে হয়—সেই বলে না, বংশে আছে, রক্তের মধ্যে আছে—পালাবেনটা কোথায়? উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার রায়, লীলা মজুমদার, সুখলতা রাও, অবশেষে আপনি; শিশুসাহিত্য, শিশু-উপন্যাস আর এখন তো শিশুচিত্রেও—উত্তরাধিকারকে অস্বীকার করা বড়ো শক্ত।

স. আই ডোণ্ট নো। ইন ফ্যাক্ট, ছড়া-টড়া কোনোদিন আমি—আমার ছেলে-বেলা থেকে কবিতা বা ছড়া লেখার যে কোনো ঝোঁক ছিলো তা নয়। আমি প্রথম ছড়া লিখলাম 'সন্দেশ'-এ এবং সেটা হচ্ছে লিয়রের অনুবাদ। 'সন্দেশ'-এর দ্বিতীয় না তৃতীয় সংখ্যায় বেরিয়েছিলো। তারপর লুইস-লিয়রের প্রায় তিরিশ-চল্লিশটি লিমেরিক, লিয়রের কয়েকটি বড়ো কবিতা এবং ক্যারলের 'জ্যাবারওয়কি' থেকে শুরু ক'রে যতো কবিতা এক্সেপ্ট লঙ ওয়ান্স লাইক 'হান্টিং অব দি স্নাক" অনুবাদ করেছি। 'অ্যালিস'-এর ভেতরে যতো কবিতা আছে, 'সং অব দি হোয়াইট নাইট'-টাইট—সব অনুবাদ করেছি।

প্র. 'জ্যাবারওয়কি' কোন সময়ে অনুবাদ করেছিলেন?

স. ধরুন, 'সন্দেশ'-[এর] আজ এইট্থ ইয়ার চলছে—সাত বছর আগে। ঐ রবীন্দ্রনাথের সেন্টিনারি হ'লো—তার পরেই ৬১-তে বোধহয় 'সন্দেশ' রিভাইভ্ড হ'লো। ৬১-তেই তো আমার অনেকগুলি কবিতা বেরিয়েছে। তারপরে বেরোলো বোধহয় প্রোফেসর শঙ্কুর বড়ো গপ্পোটা। তারপর শঙ্কু একটা চরিত্র তৈরি হ'য়ে গেলো—শঙ্কু নিয়ে একগাদা—তারপর ঐ ফেলুদা হ'লো। ফেলুদার প্রথম দুটো শর্ট স্টোরি বেরোলো—তারপর এই উপন্যাস লিখলাম—এই প্রথম উপন্যাস—'বাদশাহী আংটি'।

প্র. লিয়র বা ক্যারলের অনুবাদগুলো বই হিশেবে বের করবার পরিকল্পনা নেই?

স. না, ওটা আমি একটা বই নিজে বার করছি—ওটা আমার ছড়াগুলো নিয়ে। নাম হবে, 'তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম'। [নামটা বাবার 'আবোল-তাবোল' থেকে নেওয়া।]

প্র. এ সাক্ষাৎকার শেষ করতে চাই যে প্রশ্ন দিয়ে তা হ'লো—চলচ্চিত্রসৃষ্টির

ফাঁকে-ফাঁকে সাহিত্যকে দ্বিতীয় শিল্পমাধ্যম হিশেবে ব্যবহার করার কোনো অভিলাষ নেই আপনার? অর্থাৎ ভবিষ্যতে সাহিত্যে কোনো কিছু করার, কি

স. ছবির কাজ ক'রে যেটুকু সময় আমার হাতে থাকে তার মধ্যেই আমার লেখা। এ-সময়টা খুব বেশি নয়, তাছাড়া উপন্যাস জাতীয় সীরিয়াস বড়ো কিছু লেখার তাগিদও অনুভব করি না। 'সন্দেশ' যতোদিন আছে, ততদিন ছোটো গল্প, ছড়া ইত্যাদি লিখতেই হবে, হয়তো 'বাদশাহী আংটি' জাতীয় ধারাবাহিক উপন্যাসও হ'তে পারে। এটা শুধু দায়িত্ব নয়, এতে বেশ একটা মজাও আছে। এছাড়া ফিল্ম সংক্রান্ত কিছু প্রবন্ধ হয়তো লিখতে পারি, এ জিনিশটার দরকার আছে। এক্সটেনসিভ কিছু লেখার যে-ইচ্ছেটা আছে, সেটা ফিকশন পর্যায়ভুক্ত নয়। সেটা হ'লো ট্রিলজি তৈরির অভিজ্ঞতা নিয়ে একটা বই লেখা। এতে ফিল্মের কথাও যেমন থাকবে—প্রধানত আমি কীভাবে ঠেকে শিখেছি—তেমনি ফিল্মের সঙ্গে জড়ানো আরো পাঁচ রকম অভিজ্ঞতার কথাও থাকবে। দু-একটি বিদেশী পাবলিশার বিষয়টা সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। কতদূর কী হবে তা জানি না।



শেষ সাক্ষাৎকার

‘স্বদেশে আমার বাজার খুবই সীমিত’

[প্রথম প্রকাশ : আজকাল]

সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে এই সাক্ষাৎকার ৪ জানুয়ারি থেকে ১৪ জানুয়ারির ১৯৯২ মধ্যে গৃহীত হয়েছিল। প্রথমার্ধে প্রশ্নের জবাবগুলি সত্যজিৎ দিয়েছিলেন ইংরেজিতে, কারণ সে অংশের প্রশ্নকর্তা ছিলেন জ্যোতির্ময় দত্ত ছাড়াও লণ্ডনের দি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পত্রিকার টিম ম্যাকগার্ক। দ্বিতীয়ার্ধের পুরোটাই বাংলায়, সুতরাং ভাষা সত্যজিতের নিজস্ব। প্রথম অংশটি অনুবাদ। ১, বিশপ লেফ্রয় রোডের তিনদিক খোলা সত্যজিতের স্টাডিতে। শুধু কি তিনদিক? এত দিকে জানালা-খোলা ঘর বোধহয় পৃথিবীতেই আর নেই। পিয়ানোর উপর বেটোফেনের বাস্ট। আইজেনস্টাইনের ফোটোগ্রাফ। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের জীবনী। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলার ইতিহাস। লিওনার্দো। হবসন জবসন। আরাম কেদারায় আরোগ্যের অপেক্ষায় অর্ধশায়িত সত্যজিতের হাত কিন্তু পুরো সাক্ষাৎকারকালে থামেনি, ক্লিপবোর্ডে স্ক্রিব্‌ল করে যাচ্ছিলেন।

প্র. ‘সিটি অফ জয়’ বিষয়ে…?

স. ‘সিটি অফ জয়’ বিষয়ে আমার মত তো আগেই দিয়েছি। এরপর কিন্তু ছবি তোলা শেষ। কিছুটা বম্বেতে, শেষ অংশ বিলেতে তুলে ওরা মার্চে খুলছে। ওটা যে কি পদের ছবি তা তো আগেই জানিয়ে দিয়েছি। লুই মালের ছবি, যা ভারতে নিষিদ্ধ হয়েছিল। সেটা আমি দেখিনি। উনি ছবি করার আগে আমার সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। তবে শুনেছি তিনি যা বলেছিলেন তার সঙ্গে তোলা ছবির কোনও মিল নেই। ভারতীয় বিষয়ে পশ্চিমিদের ছবিতে সবসময়ই একটা কিছু-না কিছুর অভাব থাকে। ধরুন টিনটিন কমিকস্—আমি যার ভীষণ ভক্ত—অপূর্ব আঁকা—আমার সবকটা বই আছে—হিন্দি কথোপকথন বেলুনের মধ্যে ধরা—দেবনাগরী হরফে। কিন্তু একটি ভারতীয় মেয়ের শাড়িও ঠিকমত পরানো নেই। নারকোল গাছগুলিও ভুল আঁকা। এটা পারে না ওরা আঁকতে।

প্র. টিনটিন কিংবা টাঁ-ট্যাঁর, স্রষ্টা হার্জ বা হেরগে বিষয়ে…

স. হ্যাঁ হেরগে বিষয়ে পরে অবশ্য অনেক রটনা শুনেছি। বিশেষত ওর ফ্যাসিস্ট যোগাযোগ নিয়ে অনেক কালি ঢালা হয়েছে। কিন্তু ইলাস্ট্রেটর হিশেবে তিনি চমৎকার। এইরকম একজন যে শাড়ি কি নারকোল গাছ আঁকতে গিয়ে জব্দ হবেন সেটাই প্রমাণ যে পূর্ব পূর্বই, পশ্চিম পশ্চিমই। ভারত বিষয়ে যে একমাত্র পশ্চিমি ছবি প্রায় আগাগোড়া বিশ্বাসযোগ্য টিভি সিরিয়াল তা হল 'দ্য জুয়েল ইন দি ক্রাউন'। দেখে মনে হয় যথেষ্ট যত্ন নিয়ে করা হয়েছে। কোথাও খটকা লাগে না চোখে। আর একটাও ছবির কথা ভাবতে পারছি না এখন যেটা উদ্ভট মনে হয় না।

প্র. কেন ?

স. জ্ঞানের অভাব। প্রস্তুতির অভাব। ঠিকমতো হোমওয়ার্ক করে না ওরা। গবেষণা নেই, শ্রদ্ধা নেই। কেবলই চমকের চেষ্টা। স্পিলবার্গের 'দ্য টেম্পল অফ ডুম'-এর ভোজের দৃশ্য মনে আছে ? ঐরকম খাবার কোনও ভারতীয় ভোজে পরিবেশিত হতেই পারে না। স্যুপটা, তারপর সেই অদ্ভুত অদ্ভুত। সঠিক উপাদান মনে নেই…

প্র. স্যুপে সাপ কিলবিল করছিল, প্রধান পদ ছিল কী যেন পশুর চোখ আর চোখ, রান্না সত্ত্বেও প্রায় জ্যান্ত, ড্যাব-ড্যাব করে তাকিয়ে আছে।

স. পশ্চিমের ভারত বিষয়ে কৌতূহল আছে, কিন্তু জ্ঞানের গভীরতার অভাব। তাছাড়া সেভাবে গায়ে গায়ে মেশেনি এদেশীয়দের সঙ্গে। আমরা যেভাবে ওদের ওতপ্রোতভাবে জানি, যেভাবে এমনকি ক্রিকেট ব্যাট কি সঙ্গীতে বেহালার ছড় টেনেছি ওদের তালে তালে। আমার ঠাকুর্দা তো ছিলেন ইউরোপিয় রেনেসাঁ মানব। ছাদে দূরবীন, নিচের তলায় ছাপাখানা ও সে যুগের সেরা হাফটোন ব্লক প্রস্তুতির ক্যামেরা, আর তাঁর অপর চার ভাইয়ের কেউ বা ছিলেন গণিতের, কেউ সংস্কৃতের অধ্যাপক। কেউ কেউ আবার কেতাদুরস্ত ক্রিকেটার। আমাদের পরিবারে যেমন পশ্চিমের যন্ত্রের প্রতি আগ্রহ ছিল, তেমন প্রাচ্যের জুডোর প্রতি…

প্র. প্রাচী-পশ্চিমের প্রতি কৌতূহল তো আপনারও। এবং জীবনের প্রতি…

জীবনের প্রতি অনুরাগ

স. আমি অবশেষে আরোগ্যের পথে। সদ্য শেষ করেছি একটি চিত্রনাট্য যার শুটিং আশা করছি, শুরু হবে ফেব্রুয়ারির গোড়ায়। ধীরে ধীরে ফিরে

আসছে বল। বিষয়? এখন যাকে ঘিরে নিত্য চিন্তা—চিকিৎসার প্রগতি এবং তার দ্বারা উপকৃত হচ্ছে কারা? ধরুন, গতকাল যে ইঞ্জেকশন আবিষ্কৃত হলো, তার সুফল আমি নিজে পেয়েছি, যে ইঞ্জেকশন তার ঠিক আগে তা বেরুলে আমি বেঁচে উঠতুম না, তার দাম ছিল ৪,০০০ টাকা। এখন তার চেয়েও উন্নত, দ্রুত-ফলদ ইঞ্জেকশন বেরিয়েছে, যার দাম ২০,০০০। এটা প্রগতি বটেই। কিন্তু এই প্রগতি সমাজের কয় শতাংশের সঙ্গতির মধ্যে? এই নিয়ে আমার চিত্রনাট্যের দোটানা।

প্র. যাক, আপনি তাহলে আবার লিখতে পারছেন!

স. আবার লিখতে? আবার পড়তে পারছেনও বলুন, কারণ গত বহু মাস আমি যে এক দুরারোগ্য ভাইরাসের কবলিত ছিলাম তাই নয়, চোখে ছানিও ছিল, যা নাকি অস্ত্রোপচারের পক্ষে যথেষ্ট পরিণত নয়। ভাগ্যিস এক তরুণ চিকিৎসক, ডঃ আশিস ভট্টাচার্য, চারু এভিনিউতে চেম্বার, বললেন, ছানিপাকার থিওরি একদম বাতিল। আর ফালতু সময় অপব্যয় না করেই তিনি তৎক্ষণাৎ অস্ত্রোপচার করে আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে দিলেন। ডঃ ভট্টাচার্য সাত বছর ছিলেন মাদ্রাজের ডঃ বৈদ্যনাথনের নেত্রালয়ে। মাত্র তিনদিন—ব্যস, তারপরেই আবার বই পড়তে শুরু করতে পারলুম। গোগ্রাসে পড়তে লাগলুম সেইসব বৃহৎ ও মহৎ ক্ল্যাসিকস যা আমার অপব্যয়িত সিনেমাসক্ত যৌবনে অবহেলা করেছি। তখন পড়া মানে ছিল রাত্রে ভেদির্ কিংবা ব্রাহ্মস শুনতে শুনতে শার্লক হোমসের কীর্তিকলাপ কাহিনী পাঠ। তখন পড়াই হয়নি টোমাস মান, টলস্টয়, ডস্টয়েভস্কি…

প্র. ক্ষমা করবেন, এর আগেই পড়েছিলেন ডস্টয়েভস্কির ব্রাদার্স কারামাজভ।

স. ঠিক। কিন্তু পড়া হয়নি 'ওয়ার অ্যান্ড পিস', 'ডঃ ফস্টাস' 'স্কার্লেট অ্যান্ড ব্ল্যাক'। এগুলি আমি রোগশয্যায় সম্প্রতি পড়লাম।

প্র. আমারও জেলখানায় এবং রোগশয্যাতেই যত আসল পড়াশুনো। গার্গাণ্টুয়া, দ্য ডিভাইন কমেডি, মহাভারত। বিপাকে না-পড়'ল ঐসব বই কে পড়ে!

স. ঠিকই। আমার হৃদরোগ-বিশেষজ্ঞ ডঃ বক্সী শুধু ভারতের এক নম্বর চিকিৎসক নন, তিনি একজন মহৎ ব্যক্তি। সপ্তাহে একদিন তিনি দলবল নিয়ে চলে যান গ্রামে—সেখানে বিনামূল্যে তিনি চিকিৎসা করেন। আমার চিত্রনাট্যে, ডঃ বক্সীর চরিত্রের ছায়া আছে। চিত্রনাট্যটির প্রথম খসড়া আমি লিখেছিলাম তিনদিনে…

প্র. সেকি! ঐ অবস্থায়…

স. দ্বিতীয় খসড়া লিখলাম চারদিনে। সংশোধিত খসড়া আমার প্রধান সম্পাদক ও সংশোধক বিজয়া রায় পড়েছেন, এবং তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী

আরও পরিমার্জন আমি করেছি। এখন আরোগ্য সঠিক হলে, নিশ্চয়ই জানুয়ারির শেষ নাগাদ আবার শুটিং শুরু করতে সক্ষম হব।

প্র. আপনি কি আপনার ছবিগুলো ফিরে ফিরে দেখেন ?

স. আরে না। সে সুযোগ আগে ছিল না। তবে এখন আমার সমস্ত ছবির বি বি সি চ্যানেল ফোর থেকে আমার ছেলের দ্বারা ক্যাসেট করা ভিডিও বাড়িতেই আছে। মাঝে মাঝে দেখে নিই। তবে আমার কাজের একটা অভ্যাস হয়ে গেছে। আমি খুব মিতব্যয়ী। আমি জানি যে ভারতের অন্তর্দেশীয় বাজারে আমার আবেদন খুবই সীমিত। মজার কথা এই যে স্বদেশে যা সবচাইতে আকর্ষণীয় হবে ভেবেছিলাম এবং বিদেশীদের কাছে দুর্ভেদ্য, সেই 'জলসাঘর'ই কিন্তু এখন সিনেমার সবচাইতে উঁচু নাক, উঁচু-ভুরু সমঝদারদের স্বর্গে, অর্থাৎ ফ্রান্সে, একটি কাল্ট আইটেম। ফ্রান্সে 'জলসাঘর' আমার সেরা কাজ বিবেচিত হয়। (সত্যজিৎ আমাদের দিকে চোখ বুলিয়ে নিজের জন্য বললেন, 'একগ্লাস জল', তারপর স্বভাবসিদ্ধ সৌজন্যবশতঃ, 'কফি না চা ?' আমি চা বলাতে দেশী-বিদেশী প্রত্যেককে আলাদা করে জিগ্যেস করলেন। তারপর বললেন, চার কাপ চা। মাঝে ডাক্তারের চেক-আপের জন্য অন্য ঘরে যেতে হয়েছিল। শরীর বিকল বটে, কিন্তু কী স্মৃতিশক্তি। কী মেধা। কম্পিউটারে বোতাম টেপার মত নামগুলি বেরিয়ে আসে।) আমার ছেলের খুব সমৃদ্ধ সংগ্রহ আছে তিরিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকের আমেরিকান ছবির। জন ফোর্ড, বিলি ওয়াইল্ডার, গ্রাউচো মার্কস, কেভিন ব্রাউনলো-কৃত 'দি আননোন চ্যাপলিন', ডব্লু সি ফিল্ডসের মিঃ মিকবার, ফ্রেড এ্যাস্টেয়ার, জিঞ্জার রজার্স—ওয়েস্টার্ন বয়, ডায়না ডারবিন—যিনি ওয়ান হান্ড্রেড মেন অ্যান্ড এ গার্ল নামক একটা ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। আরে, আমি ষোল বছর বয়সে একটা ফ্যানলেটার লিখেছিলাম তাঁকে, তিনি জবাবও দিয়েছিলেন। এখন তাঁর কোনও চিহ্ন নেই কোথাও, আমি অনেক খোঁজ করেছি।

প্র. মাত্র ষোল বছর বয়সে? অবশ্য আপনি তো ষোল বছর বয়সেই ইংল্যান্ডের বয়েজ ওন পেপারে ফোটোগ্রাফি প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়েছিলেন—তাই না ?

স. ভীষণ খুশি হয়েছিলাম তাতে। 'বয়েজ ওন' পত্রিকা আমাদের বাড়িতে আসত। ওসব সে-যুগের অ্যানুয়াল। এখনকার শারদীয়ার চাইতেও তখনকার ইঙ্গবঙ্গ বাড়িতে ওসব বেশি রাখা হত।

প্র. আচ্ছা, বাঙালী পরিবারে ছেলেরা কেন পিতৃদ্রোহী হয় না ? তারা বংশগত পেশা গ্রহণ করে কেন ?

স. এটার সঙ্গে বোধহয় দেশের চেয়ে পেশার যোগ বেশি। ইউরোপেও দেখা গেছে সঙ্গীতে—যেমন বাখ্ পরিবার। এখানেও ইমরাৎ খানের ছেলেরা ভোর থেকে উঠে বাবার হুকুম ছাড়াই রেওয়াজ শুরু করে। এটা কি দোষের? আমার ছেলে হওয়াটা সন্দীপের পক্ষে সুবিধের বদলে অসুবিধেই বেশি। ওর সাম্প্রতিক ছবি 'গুপী বাঘা ফিরে এলো'—ওরই ছবি। শুধু প্লটটা আমার আর কয়েকটা গান। কিন্তু ক্যামেরা, ডিরেকশন, চিত্রনাট্য সবই সন্দীপের। ক্যামেরা কুশলীপনায় ও একজন মাস্টার। আমার চেয়ে বেশি ওর মুন্সিয়ানা। ওর ছবিটায় ক্যামেরার টপ্পার কাজ অতুলনীয়। ওর পরবর্তী ছবিটা হবে হিন্দিতে। লোকেশন বিহারে।

প্র. আপনার স্ত্রীকে নিয়ে ছবি করেননি কেন?

স. সে কয়েকটা ছবি করেছিল বটে বিয়ের আগে—বম্বেতে এবং হিন্দিতে। কিন্তু এখন ওরও মন নেই, আমার ইচ্ছে নেই ওর ছবিতে অভিনয় করায়।

\+ \+ \+

১১।১।৯২

প্র. আচ্ছা, বঙ্কিমচন্দ্রের কোনও ছবি আপনি কেন করেননি।

স. উৎকৃষ্ট ঔপন্যাসিক হলেই যে তাঁর রচনা নিয়ে ছবি করতে হবে এমন তাগিদ আমি অনুভব করিনি।

প্র. শরৎচন্দ্র?

স. 'পথের পাঁচালি' করার ঠিক পরেই আমি 'সতী' করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তখন কাগজে বেরুলো অন্য কেউ ফিল্ম রাইট কিনেছে। তাই আমি আর এগুইনি। কিন্তু শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তা, কি তাঁর নারীর প্রতি দরদের কোনও প্রশ্নই নেই। অনেক সময় ছবি করার উপাদানের জন্য লাগে মহত্তম উপন্যাস নয়, অসম্পূর্ণ উপন্যাস।

প্র. আপনি কি তাহলে এটা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বিষয়ে বলছেন?
[সত্যজিৎ অট্টহাস্য করে উঠলেন।]

স. রবীন্দ্রনাথ কি অসম্পূর্ণ? রাজশেখর বসু? বিভূতিভূষণ?

প্র. খুবই সুন্দর উত্তর দিয়েছেন। তবু আমার মনে প্রশ্ন জাগে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কেন ছুঁয়ে দেখেননি?

স. ওঁর দুটি প্রধান উপন্যাস খুবই উঁচু, কিন্তু…

প্র. বুদ্ধদেব বসু?

স. হ্যাঁ, একটা করতে চেয়েছিলাম, ফাইনান্সিয়ার পেলাম না। হ্যাঁ—এরকম হয়। যখন একটা গল্প পড়ি, হঠাৎ গায়ে কাঁটা দেয়। বর্ণনা করা যায় না। ইন্সটিংকটের ব্যাপার। যত মহৎ লেখাই হোক, সেটা না হলে হয় না। বিদ্যুৎ চমকের মত। শংকরের উপন্যাস পড়তে পড়তেও ওরকমই হল…

প্র. অস্কার পুরস্কার কত বছরের? পেয়েছেন কজন?

স. পঞ্চাশ ষাট বছর তো বটেই—ঠিক মনে নেই। লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্টের জন্য অস্কার পেয়েছেন আমার আগে পাঁচজন—চ্যাপলিন, গ্রেটা গার্বো, কিউরাসোয়া, সোফিয়া লোরেন, কেরি গ্রান্ট। অস্কার হচ্ছে সিনেমার নোবেল প্রাইজ, সিনেমার জন্যও নোবেল প্রাইজ দিলে তো ভালই হত। মন্দ হত না। এ নিয়ে একটু ভাবুক না ওরা। আমার ছবির মধ্য দিয়ে যতো ভাল করে ওরা ভারতকে চিনেছে, অন্য কোনও মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে চেনেনি। ভারতের যতো দিক আমি দেখিয়েছি, অন্য কেউ দেখায়নি। সুতরাং, অর্থনীতি কি শান্তি পুরস্কারের মত, চলচ্চিত্রেও নোবেল পুরস্কার প্রবর্তনের সময় এসেছে। এবং নোবেল পেলে তো ভালই হয়। রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে আমি যে ছবি তুলেছি তাতে একটা মানুষ শুধু নয়, একটা সংস্কৃতি কি সভ্যতার ছবি ফুটে উঠেছে। তবে ছাব্বিশ খণ্ড রবীন্দ্র রচনাবলী যে পড়েছি তা নয়। যেটুকু আমার নিজের দরকারে লেগেছে তাই পড়েছি।

প্র. রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি?

স. ছবি মুগ্ধ করে। তাঁর সঙ্গে কারু কোনও মিল নেই। উনি অনন্য, ইউনিক ব্যাপার।

প্র. অনেকে বলে, আপনি নাকি ঋত্বিককে বিকশিত হতে দেননি, আপনিই ছিলেন ঋত্বিকের স্বীকৃতির পথে অন্তরায়।

স. ঋত্বিককে মোটেই অস্বীকার করি না। আমি ওর বিষয়ে লিখেওছি। ওর চোখ ছিল অসাধারণ। ক্যামেরাটা জানতো। ওর অনেক থিওরি ছিল, ও থিওরিতেই চলত। গল্পের লজিকে মন দিত না। ওর চিত্রকল্পের আবেদন আন্তর্জাতিক। অনেকগুলিই ভোলা যায় না। কিন্তু ওর ছবিতে অতিনাটকীয়তা ও কাকতাল বেশি…কিন্তু ঋত্বিকের মত একজন ছবিওয়ালা যে কোনও দেশের সম্পদ। যেমন কমল। কমলকুমার মজুমদার। আমরা থাকতাম ১৭২/২, রাসবিহারী এভিনিউতে। কমল উল্টোদিকে থাকত। উৎপলও থাকত। কমলের 'অন্তর্জলি যাত্রা' পড়েছি। ভয়ানক ভাল লেগেছিলো। কিন্তু ছবি করার ইচ্ছে হয়নি। পরের দিকে ওয়েভ লেন্থ বদলে গেলো। ও অন্যদিকে চলে গেলো। কমল আমার

'পথের পাঁচালি' দেখে বলেছিল, খুব খারাপ। আমি কমল বিষয়েও লিখেছি। [সত্যজিৎ সম্বন্ধে একটা নিন্দে—তিনি অহংকারী, নিজেকে ছাড়া কিছুতে তাঁর মন নেই। এটা ডাহা মিথ্যে। শুধু রবীন্দ্রনাথ কিংবা ঋত্বিক নন, বেটোফেন ও চ্যাপলিন নন, আড্ডাসঙ্গী কমলকুমার, শিল্পগুরু বিনোদবিহারীও নয়, বিদেশি বন্ধু ডেভিড ম্যাক্‌কাচান বিষয়েও তিনি মর্মস্পর্শী লেখা লিখেছেন। অপরের গুণের স্বীকৃতি সত্যজিৎ যত দিয়েছেন, তাঁর সমসাময়িকেরা কি স্বদেশবাসীরা তাঁকে দিয়েছে কি ?]

প্র: অস্কার নিতে ৩০ মার্চ আমেরিকা যাচ্ছেন ?

স. হয়ত সশরীরে যাব না। জেট-ল্যাগ আছে, ধকল ও ঝক্কি তো কম নয়। তবে ওরা বিশেষ অ্যান্টেনা বসিয়ে, দুটি উপগ্রহ মারফত এমন ব্যবস্থা করে দেবে, যাতে কলকাতা থেকেই আমি উৎসবে অংশগ্রহণ করতে পারব। আধুনিক প্রযুক্তি দারুণ জিনিস, তাই না ?

চলচ্চিত্র পঞ্জী

কাহিনীচিত্র

১৯৫৫ পথের পাঁচালী, ১৯৫৬ অপরাজিত, ১৯৫৭ পরশ পাথর, ১৯৫৮ জলসাঘর, ১৯৫৯ অপুর সংসার, ১৯৬০ দেবী, ১৯৬১ তিনকন্যা, ১৯৬২ কাঞ্চনজঙ্ঘা, ১৯৬২ অভিযান, ১৯৬৩ মহানগর, ১৯৬৪ চারুলতা, ১৯৬৫ কাপুরুষ ও মহাপুরুষ, ১৯৬৬ নায়ক, ১৯৬৭ চিড়িয়াখানা, ১৯৬৯ গুপী গাইন বাঘা বাইন, ১৯৭০ অরণ্যের দিনরাত্রি, প্রতিদ্বন্দ্বী, ১৯৭১ সীমাবদ্ধ, ১৯৭৩ অশনি সংকেত, ১৯৭৪ সোনার কেল্লা, ১৯৭৫ জন অরণ্য, ১৯৭৭ শতরঞ্জ কে খিলাড়ী, ১৯৭৯ জয় বাবা ফেলুনাথ, ১৯৮০ হীরক রাজার দেশে, ১৯৮৪ ঘরে বাইরে, ১৯৮৯ গণশত্রু, ১৯৯০ শাখা প্রশাখা, ১৯৯১ আগন্তুক।

তথ্যচিত্র

১৯৬১ রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ সিকিম, ১৯৭২ ইনার আই, ১৯৭৬ বালা, ১৯৮৭ সুকুমার রায়।

দূরদর্শন চিত্র

১৯৬৪ টু, ১৯৮১ সদ্গতি, ১৯৮২ পিকু।